আহার ও আহার্য
লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

আমরা পর্যায়ক্রমে লোকশিক্ষা পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছি। শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না। যত সহজে যত দ্রুত এবং যত ব্যাপক ভাবে এই ভার লাঘব করা যায় সেজন্য তৎপর হওয়া কর্তব্য। গল্প এবং কবিতা বাংলা-ভাষাকে অবলম্বন করে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক।

বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান-চর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব, জ্ঞানের সেই পরিবেষনকার্যে পাণ্ডিত্য যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লোক অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সহজ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ। এই কারণে আমাদের গ্রন্থগুলিতে ভাষার আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারা যাবে বলে আশা করি নে কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আহার ও আহার্য

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

রসদ-সংগ্রহ

বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রাণীমাত্রেরই খাদ্যের প্রয়োজন হইবে, প্রকৃতির এই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। প্রকৃতি আমাদের রক্ষা করিবার ভার আমাদের নিজের নিজের উপরেই সমর্পণ করিয়াছে, উপযুক্ত খাদ্য দিয়া তাহা রক্ষা করিতে হইবে। এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম চলিবে না।

কিন্তু কেন এই খাদ্যের প্রয়োজন। শরীর হইতে দৈনন্দিন যাহা খরচ হইয়া যাইতেছে তাহা নিত্য পূরণ করিয়া লইবার জন্য। জীবনকে যদি অগ্নির সহিত তুলনা করা যায় তবে খাদ্যকে বলিতে হইবে উহার ইন্ধন। অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখিতে হইলে যেমন তাহাতে নিত্যনূতন ইন্ধন যোগাইতে হয়, আমাদের জীবনাগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবার জন্যও সেইরূপ নিত্য আমাদিগকে খাদ্যের ইন্ধন যোগাইতে হইবে। জীবনের স্ফুলিঙ্গ আমাদের শরীরের প্রত্যেক কোষে কোষে বিদ্যমান, ঐ সকল কোষ প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং কোষগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য উহার প্রত্যেকটিতে বাহির হইতে খাদ্যের ইন্ধন সরবরাহ করিতে হইবে।

আমাদের দেহ একপ্রকার যন্ত্রস্বরূপ, মোটরগাড়ির এঞ্জিনের সহিত উহার তুলনা করা যায়। মোটরগাড়ি যেমন পেট্রোল, মোবিল-অয়েল প্রভৃতি ইন্ধন ভিন্ন চলিতে পারে না, শরীরও তেমনি উহার উপযুক্ত ইন্ধনগুলি ব্যতীত চলিতে পারে না। কিন্তু এরূপ তুলনাই যথেষ্ট নয়, মোটরগাড়ির সহিত আমাদের শরীরের অনেক বিষয়ে পার্থক্যও আছে। ইন্ধনের অভাব হইলে মোটরগাড়ি বরং কিছুদিন ফেলিয়া রাখা যায়, যখন উহাকে বিশ্রাম দেওয়া যায় তখন ইন্ধন যোগাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শরীরের সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে না, কারণ প্রতি-মুহূর্তে উহাকে ক্রিয়া করিতে হইতেছে, তেমন বিশ্রাম উহার কখনোই

নাই। গভীর নিদ্রার সময়েও উহার হৃদ্‌পিণ্ডের কাজ চলিতে থাকে, রক্ত চলাচল হইতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে। এইগুলিও শরীরের আভ্যন্তরিক পরিশ্রম, কারণ ইহাতেও শক্তির ক্ষয় হইয়া থাকে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড একবারমাত্র সংকুচিত হইবার জন্য যে শক্তির খরচ করে, ঐ পরিমাণ শক্তির দ্বারা দুই পাউণ্ডের জিনিস এক ফুট উচ্চে উঠাইতে পারা যায়। অতএব ঘুমের সময় আমাদের হৃদ্‌পিণ্ড যদি মিনিটে ৭০ বার ধুকধুক করে, তবে উহা প্রত্যেক মিনিটে ১৪০ ফুট-পাউণ্ড শক্তির ব্যয় করিয়া থাকে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রকার শক্তি ব্যয়ের এক মুহূর্তও বিরতি নাই। সুতরাং আপন যন্ত্রটিকে চালু রাখিবার জন্য চিরদিনই শরীরকে ইন্ধন দিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, নতুবা উহা অচল হইয়া যাইবে।

মোটামুটি তিনটি কারণে শরীরকে খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন,— উহার কর্মশক্তির ইন্ধন যোগাইবার জন্য, উহার উত্তাপ বজায় রাখিবার জন্য, এবং ক্ষয়প্রাপ্ত শরীরবস্তুর নিত্যক্ষতি পূরণ করিবার জন্য। অতএব খাদ্য বলিতে কেবলমাত্র তাহাকেই বুঝাইবে— যাহা আমাদের কর্মশক্তি দিতে পারে, যাহা তাপের সৃষ্টি করিতে পারে এবং যাহা শরীরের মাংসাদি নানাপ্রকার তন্তুগুলিকে নিত্য নূতন গড়িয়া তুলিবার কাজে লাগিতে পারে। এ ছাড়া অন্য কিছুকেই খাদ্য বলা চলিবে না, তাহা যতই মুখরোচক হউক। বস্তুত রসনার তৃপ্তি করা খাদ্যের একটা আনুষঙ্গিক ক্রিয়া মাত্র, উহা খাদ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

শরীরের দৈনন্দিন অভাব মিটাইবার জন্যই খাদ্য। এই অভাব একপ্রকার নয়, ইহা বহু প্রকারের। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, শরীরের মধ্যে বহু প্রকারের মৌলিক উপাদান আছে, যথা— নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন, সাল্‌ফার, ফস্‌ফরাস,

ক্লোরিন, আইওডিন, পটাসিয়ম, সোডিয়ম, ক্যালসিয়ম, ম্যাগনিসিয়ম, আয়রণ ইত্যাদি। এই সুবৃহৎ তালিকার প্রত্যেকটি বস্তুকে যদি আমাদের প্রত্যহ এক এক করিয়া পূরণ করিতে বসিতে হইত তাহা হইলে আর আমাদের রক্ষা ছিল না। দেহটি রাসায়নিক যন্ত্রবিশেষ হইলে হয়তো আমাদের তাহাই করিতে হইত। সৌভাগ্যের বিষয়, ইহা সেরূপ জড়যন্ত্র নয়, ইহা জৈবযন্ত্র, এবং জৈবপ্রকৃতি হইতেই খাদ্য দ্বারা ইহা ঐ সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া লয়। যদিও রাসায়নিক উপাদানগুলিকে ইহার নিত্য প্রয়োজন, তথাপি তাহা মৌলিকভাবে গ্রহণ করিতে ইহার কোনো স্পৃহা নাই। সুতরাং ঐ সুবৃহৎ তালিকা লইয়া হিসাব করিতে বসিবারও আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই।

জীবজগতে খাদ্যসম্বন্ধে একপ্রকার রহস্যজনক ব্যবস্থা আছে। কোনো জীবই জৈবপদার্থ ভিন্ন অন্য কোনো বিজাতীয় বস্তুকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে না। বলা বাহুল্য উদ্ভিদ জাতীয় যাহা কিছু সমস্তই জৈব-পদার্থের অন্তর্গত। উদ্ভিদেরা কেমন করিয়া জন্মায় এবং কিসের দ্বারা পুষ্ট হয়, ইহার অনুসন্ধান লইলে জানা যাইবে যে, তাহার মধ্যেও অনেক রহস্য আছে। আমাদের শরীরস্থ যে সকল রাসায়নিক মৌলিক উপাদানের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইল ঐগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে মাটিতে, জলে এবং বায়ুতে। উদ্ভিদেরা এইগুলিকে শুষিয়া লইয়া তদ্দ্বারা পুষ্ট হইয়া শাখায়, পত্রে, ফলে ও শস্যে বিচিত্র হইয়া ওঠে। নিম্নতর প্রাণীরা ঐ সকল গাছপালা হইতে খাদ্য আহরণ করে। আবার উচ্চতর প্রাণীরা ঐ নিম্নতর প্রাণীদের হইতে সেই খাদ্য পুনর্বার আহরণ করে। প্রকৃতির জৈব সৃষ্টিরক্ষা এইরূপেই নিম্নতর স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে পরম্পরাক্রমে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ লইয়া নিত্যকাল চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু সে কথা যাক। সকলেরই খাদ্য প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই, এখন আমাদের জানিতে হইবে কী কী খাদ্য আমাদের মানবজাতির পক্ষে প্রয়োজন। আমরা প্রাণীজগতের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত, সুতরাং আমাদের খাদ্যপ্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা জটিল। এক প্রকার খাদ্যে আমাদের চলে না, বহু প্রয়োজনে আমাদের বিবিধ প্রকার খাদ্য চাই। নানা দিক দিয়া শরীরের বিবিধ চাহিদা মিটাইতে হইবে, তবেই পুষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ হইবে। এ কথা সত্য বটে যে, খাইবার সময় কেহই এ সকল বিষয়ে বিচার করিয়া খায় না, সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুসারে খাইয়া থাকে, এবং ইহাই স্বাভাবিক। ক্ষুধা ও রুচি প্রভৃতি বৃত্তির এইজন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। "আপ্ রুচি খানা"—ইহা সর্ববাদিসম্মত কথা। সুস্থ অবস্থার পক্ষে এই কথাই সত্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় যথাইচ্ছা খাইয়া সকলেই সুস্থ থাকিতে পারে না। অবস্থাগতিকে ও কার্যগতিকে আমরা খাদ্য সম্বন্ধে নানারূপ ভুল-ভ্রান্তি করিয়া ফেলি। কেহ বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাই এবং না জানিয়া শরীরের অনিষ্ট করি, কেহ বা প্রয়োজনমতো খাইতে পাই না, কেহ বা অজ্ঞতাহেতু প্রয়োজন-মতো খাইবার চেষ্টা করি না। ফলে অধিক খাওয়ার জন্য অসুস্থতা ঘটে, অল্প খাওয়ার জন্যও অসুস্থতা ঘটে। এই সকল অসুস্থতা ও অসম্পূর্ণতাকে বাঁচাইয়া চলিবার জন্যই খাদ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি আমাদের যথাসম্ভব জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

খাদ্য সম্বন্ধে জানিতে হইলে প্রথমে ক্রিয়া অনুসারে খাদ্যসমূহকে ভাগ করিয়া লইতে হইবে। ইহার বিশেষ আবশ্যক আছে। যে-কোনো এক প্রকার খাদ্য খাইলেই যদি আমাদের চলিয়া যাইত, তাহা হইলে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু তাহা হয় না। এক প্রকার খাদ্য খাইয়া পেট ভরিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে কাজ চলে না। সুতরাং

ক্রিয়া অনুসারে খাদ্যগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করিয়া লওয়া উচিত এবং তন্মধ্যে কোনোটি যাহাতে বাদ না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

জল

অন্য খাদ্যের কথা বলার প্রারম্ভে আগে জলের কথা বলিয়া লই। জলকে ঠিক খাদ্য বলা চলে না, কিন্তু যেহেতু ইহা শরীরের প্রয়োজনে গ্রহণ করিতে হয় সেই হেতু ইহা খাদ্য। প্রয়োজন হিসাবে ইহার মূল্য আসল খাদ্যগুলি অপেক্ষাও অধিক। অভুক্ত থাকিয়াও মানুষ কয়েকটা দিন বাঁচিতে পারে, কিন্তু নির্জলা অবস্থায় তাহাও পারা যায় না। ইহার কারণ আমাদের শরীরের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই আছে জলীয় পদার্থ। শরীরের ভিতর সর্বত্রই জলের আবশ্যক। দেহের প্রত্যেক সূক্ষ্মতম কোষটি জলভারে টলটল করিতেছে, তাহার প্রোটো-প্লাজমের মধ্যে অধিকাংশই জল। জলের সহিত মিশিয়া তরল হইয়া না আসা পর্যন্ত কোনো খাদ্যকেই ঐ কোষগুলি গ্রহণ করিতে পারে না। সেইজন্য আমাদের রক্তও তরল, আর সকল প্রকার শরীর-রসই তরল, এবং জলই তাহার মধ্যে প্রধান বস্তু।

খাদ্য বিভাগ

জলের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের তাবৎ খাদ্যসমূহকে কতকগুলি প্রধান প্রধান পর্যায়ে ভাগ করিয়া লইতে হইবে। সাধারণ বিচার হইতে আমরা খাদ্যকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া থাকি,— নিরামিষ ও আমিষ,— অর্থাৎ যে খাদ্য স্বচ্ছন্দজাত উদ্ভিদাদি হইতে সংগৃহীত হয়, এবং যে খাদ্য প্রাণী হইতে সংগৃহীত হয়। রীতি ও সংস্কারের দিক দিয়া এইরূপ বিভাগের মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু শরীরের প্রয়োজনের দিক দিয়া

দেখিতে গেলে আমাদের উদ্দেশ্য উহাতে সিদ্ধ হইবে না। কারণ ক্রিয়া হিসাবে কতকগুলি নিরামিষের মধ্যেও আমিষের গুণ আছে, আবার কতকগুলি আমিষের মধ্যেও নিরামিষের গুণ পাওয়া যায়। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণ রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা খাদ্যমধ্যস্থ মুখ্যবস্তুগুলিকে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং যে প্রকার খাদ্যের মধ্যে যে জাতীয় মুখ্যবস্তু সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে থাকিতে দেখা যায় তাহাকে ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। খাদ্যের ক্রিয়া বুঝিবার জন্যই এইরূপ বিভাগের আবশ্যক। কিন্তু এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, বৈজ্ঞানিক যে-ভাবে খাদ্যকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে চায় প্রকৃতি ঠিক সেইভাবে পৃথক্ করিয়া খাদ্যের জন্ম দেয় না। সুতরাং অনেক সময় একই খাদ্যের মধ্যে দুই তিন বা ততোধিক শ্রেণীর মুখ্যবস্তু একত্রে মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। অতএব যদিও বৈজ্ঞানিকের শ্রেণী-বিভাগ সকল খাদ্যের পক্ষে নিখুঁত নয়, তথাপি যেহেতু বিভিন্ন কয়েকটি মুখ্যবস্তু শরীরের মধ্যে গিয়া এক একটি নির্দিষ্ট প্রকারের ক্রিয়া করে, সেই হেতু ঐ সকল মুখ্যবস্তুর প্রাধান্য অনুসারে উহাদেরই নাম দিয়া খাদ্যগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ভুক্ত করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

বৈজ্ঞানিক মতে খাদ্যসমূহকে মোটামুটি ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে,— যথা কার্বোহাইড্রেট বা শস্যাদি শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন বা মাংসাদি পলীয় খাদ্য, তৈলাদি স্নেহজাতীয় খাদ্য, লবণাদি পার্থিব খাদ্য, ভিটামিনযুক্ত খাদ্য, এবং মসলা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক খাদ্য।

কার্বোহাইড্রেট

ইহার এইরূপ নামকরণ হইবার কারণ এই যে ইহাতে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নির্দিষ্ট মাত্রার সংমিশ্রণে রহিয়াছে। কিন্তু

সহজভাবে জানিতে গেলে জগতে যত প্রকারের উদ্ভিজ্জ শস্য ও বীজ ও শর্করাদি মিষ্টদ্রব্য আছে, সমস্তই কার্বোহাইড্রেট। অতএব আমাদের অধিকাংশ নিরামিষ খাদ্যই এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। একদিকে চাল (উহা হইতে ভাত, চিঁড়া, মুড়ি, খই ইত্যাদি), যব (উহা হইতে বার্লি), গম (উহা হইতে আটা, ময়দা, সুজি), জওয়ার, বাজ্‌রা, ভুট্টা, জই, সাগু, শটি, এরারুট,— আর একদিকে আলু, মূলা, কচু, ওল, গাজর প্রভৃতি নানাপ্রকারের কন্দজাতীয় উদ্ভিদ,— এবং অন্যদিকে চিনি, গুড় প্রভৃতি যাবতীয় মিষ্ট বস্তু,— সমস্তই কার্বোহাইড্রেট। এই কার্বোহাইড্রেটই আমাদের শরীরকে ক্রিয়াশীল রাখিবার পক্ষে প্রকৃত দাহ্যস্বরূপ ইন্ধন। ইন্ধন যেমন বায়ু সংযোগে দাহ হইয়া অগ্নি উৎপাদন করে, কার্বোহাইড্রেটও সেইরূপ শরীরের মধ্যে গিয়া অক্সিজেন সংযোগে দাহ হইয়া উত্তাপ ও তেজ উৎপন্ন করে। কার্বোহাইড্রেট মাত্রই প্রথমে হজম হইয়া সহজদাহ্য গ্লুকোজ নামক দ্রব্যে পরিণত হয়, এবং উহা তখন শরীরের প্রত্যেক কোষে কোষে ও রক্তের মধ্যে গিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং প্রয়োজনমতে দাহ করিবার জন্য উহাই খরচ করা হয়। মোটরগাড়ির পেট্রোলের সঙ্গেই ইহার ঠিক তুলনা করা চলে। মোটরগাড়ি যতটা চলিবে সেই মাপেই যেমন উহাতে পেট্রোল ঢালিবার প্রয়োজন হইবে, তেমনি আমাদের শরীরের যতটা পরিশ্রম হইবে, সেই মাপেই উহার কার্বোহাইড্রেট খাদ্য সরবরাহ করার প্রয়োজন হইবে।

তৈলাদি স্নেহজাতীয় খাদ্য

এইগুলির মধ্যেও কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিভিন্নরূপ সংমিশ্রণে বর্তমান। নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ তেল (সরিষার তেল,

নারিকেল তেল, ওলিভ অয়েল প্রভৃতি) এবং যাবতীয় জান্তব ঘৃত ও চর্বি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তদ্ভিন্ন স্বভাবতও ইহা কিছু কিছু পরিমাণে মাংসে, মাছে, ডিমে, দুধে এবং পেস্তা বাদাম প্রভৃতি মেওয়া ফলের মধ্যে থাকে। এই খাদ্যের ক্রিয়াও অনেকটা কার্বোহাইড্রেটেরই মতন, কিন্তু ইহার সর্বাপেক্ষা প্রধান গুণ শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি করা। সমান পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহজাতীয় খাদ্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে কার্বোহাইড্রেটে যতটা শারীরিক উত্তাপ জন্মায় ইহাতে তাহা অপেক্ষা ঠিক দ্বিগুণ উত্তাপ জন্মাইতে পারে। কেবল শরীরের মধ্যে নয়, বাহিরেও এই দুইপ্রকার খাদ্যকে পোড়াইয়া দেখিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যাইবে। সকলেই জানেন, অগ্নির তেজ বাড়াইবার জন্য আমাদের দেশের যাগযজ্ঞে হোমাগ্নিতে ঘৃতের আহুতি দেওয়া হয়। খাদ্যের এই তাপোৎপাদিকা শক্তি মাপিয়া দেখিতে পারা যায় এবং বৈজ্ঞানিক ভাষায় উহার নাম দেওয়া হয় ক্যালোরি। প্রত্যেক খাদ্যেরই এই তাপোৎপাদক গুণ অর্থাৎ ক্যালোরি-মূল্য আছে কিন্তু তন্মধ্যে কেবল স্নেহজাতীয় খাদ্যের ক্যালোরি-মূল্যই সর্বাপেক্ষা অধিক। সেইজন্য শীতের দেশে ইহার অধিক প্রয়োজন, গরমের দেশে অল্প। মেরুপ্রদেশের এস্‌কিমো জাতি যে পরিমাণে চর্বি খাইয়া থাকে তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। আমাদের গরম দেশে শুধু কার্বোহাইড্রেট দিয়াই শরীরের উত্তাপ রক্ষার কাজ বেশ চলিয়া যায়।

প্রোটিন

এই জাতীয় খাদ্যের মধ্যে সর্বপ্রধান মুখ্য-বস্তু নাইট্রোজেন। এই নাইট্রোজেন কেবল প্রোটিন ছাড়া অন্য কোনো প্রকার খাদ্যের মধ্যে থাকে না, সেইজন্য নাইট্রোজেনযুক্ত খাদ্য বলিতে প্রোটিনকেই বুঝায়।

প্রোটিন উপাদানটি জীবদেহের সর্বত্রই বিদ্যমান, উহার প্রত্যেক কোষে কোষে জৈবনিকের (প্রোটোপ্লাজম্) মধ্যে প্রোটিন আছে, সুতরাং জীবমাংসই প্রোটিন পদার্থের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু মাংস ছাড়াও অনেক প্রকারের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য আছে। নিরামিষের মধ্যে পনির (চীজ) ও ছানা অতি উত্তম প্রোটিন, মাংস অপেক্ষা কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। ডিমও সম্পূর্ণরূপে প্রোটিন খাদ্য, মাছও তাই, এবং দুধও তাই। এ ছাড়া ছোলা, মটর, শুঁটি, বরবটি, বাদাম, পেস্তা, আখরোট এবং নানাপ্রকার ডালের মধ্যেও প্রোটিন আছে, কিন্তু এইগুলিকে অর্ধ-প্রোটিন বা অসম্পূর্ণ প্রোটিন বলা হয়। যব, গম, ফলমূল, এবং শাক-সবজির মধ্যেও কিছু কিছু প্রোটিন আছে, কিন্তু সে নামমাত্র। প্রোটিন আমাদের শরীররক্ষার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, ইহাকে বাদ দিয়া আদৌ জীবনধারণ করা চলে না। তাহার কারণ আমাদের শরীরের কোষসমূহ প্রোটিন দিয়াই গঠিত, এবং তাহার দৈনন্দিন ক্ষয় ও ক্ষতি কেবল প্রোটিন খাদ্যের দ্বারাই পূরণ হয়। শরীরের গঠন ও মেরামত করিতে থাকাই প্রোটিন খাদ্যের একমাত্র কাজ, অন্য কোনো খাদ্যের দ্বারা এ কাজ সম্ভব হয় না। প্রোটিনের দ্বারা কতকটা কার্বোহাইড্রেটের কাজ চলে, কিন্তু কার্বোহাইড্রেটের দ্বারা প্রোটিনের কাজ চলে না। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের শরীরও প্রধানত প্রোটিন দিয়াই গঠিত, সুতরাং নিত্য প্রোটিন সরবরাহ করিয়াই উহাকে আপন মৌলিকতা রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু শরীরের প্রোটিন এক জাতের, আর খাদ্যের প্রোটিন বিভিন্ন জাতের। সেইজন্য প্রত্যেকটি খাদ্যের প্রোটিন প্রথমে পেটে গিয়া বিশ্লেষিত হইয়া অ্যামিনো-অ্যাসিড নামক রাসায়নিক দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়, তৎপরে উহা পুনরায় শরীরমধ্যস্থ নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকারের প্রোটিনে পরিণত হয়। আমিষই হউক বা নিরামিষই হউক, প্রোটিন

খাদ্যমাত্রেরই এই পরিণতি। সুতরাং প্রোটিন খাইতে হইবে বলিয়াই যে কেবল আমিষ খাইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। যাঁহারা নিরামিষাশী তাঁহারা ছানা, দুধ, ক্ষীর, দই এবং মটর, বরবটি, ডাল প্রভৃতি খাইয়াও প্রোটিনের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন।

লবণাদি

নুন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয় খাদ্য। আমাদের শরীরের রস রক্তাদির মধ্যে সর্বত্রই নির্দিষ্ট পরিমাণ নুন আছে এবং খাদ্যের মধ্য দিয়া প্রত্যহই উহার পরিমাপ বজায় রাখিতে হয়। নুন ব্যতীত অন্যান্য প্রকারের লবণও খাদ্যরূপে আমাদের প্রয়োজন, তবে সেগুলি পৃথক্‌ভাবে খাইবার প্রয়োজন হয় না, কারণ আমাদের খাদ্যের মধ্যেই আমরা স্বাভাবিকরূপে সেগুলি পাইয়া থাকি। যেমন মাংস, শুঁটি, বরবটি, পালং শাক ও অন্যান্য সবজির মধ্যে লৌহ আছে ; দুধে, ডিমে, এবং বাঁধাকপিতে ক্যালসিয়ম ও ফসফরাস আছে ; মাংসে, দুধে এবং ভাতে ম্যাগনিসিয়ম আছে ; আলু এবং অন্যান্য শাক-সবজিতে পটাসিয়ম আছে। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে ঐ সকল ধাতব লবণ আমাদের খাইবার কোনোই প্রয়োজন হয় না। কেবল রোগের সময় ঐগুলির অভাব ঘটিলে তাহার কৃত্রিম প্রয়োগ প্রয়োজন হইতে পারে।

ভিটামিন

ইহা খাদ্যমধ্যস্থ এমন এক প্রকারের উপাদান যাহার সঠিক সংজ্ঞা ভাষায় ব্যক্ত করাও কঠিন এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা ধরাও কঠিন। অথচ কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন প্রভৃতি সকল জাতীয় টাটকা খাদ্যের মধ্যেই ইহা স্বভাবত নানা আকারে সূক্ষ্ম মাত্রায় থাকে, এবং নানাভাবে তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। ইহার ক্রিয়াও একেবারে

স্বতন্ত্র প্রকারের। আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা নিতান্তই প্রয়োজন। শরীরের ইন্ধন যোগাইবার জন্য বা কোনো কিছু স্থূল উপাদানমূলক অভাব মিটাইবার জন্য নয়, কিন্তু কেবল সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকার জন্য এবং কয়েকটি রোগের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই ইহার প্রয়োজন। স্থূল খাদ্যের দ্বারা শরীরের সকল অভাবই মেটানো যায়, কিন্তু তাহাতে যদি ভিটামিনটুকু না থাকে, তবে পেট ভরিয়া সকল-কিছু খাওয়া সত্ত্বেও শরীর ভাঙিয়া পড়ে, নানারূপ রোগ আসিয়া পড়ে। এই সূক্ষ্মজাতীয় বিশিষ্ট বস্তুটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্বে জানা ছিল না, মাত্র পঁচিশ বৎসর হইল জানা গিয়াছে। টাটকা ফলের অভাবে একরকম রক্তের রোগ হইতে দেখা যায়, টাটকা ফল খাইলেই তাহা আরোগ্য হইয়া যায়। এই তথ্য হইতেই ভিটামিনের আবিষ্কার। তাহার পর দেখা যায় যে, এক প্রকারের নয়, অনেক প্রকারের রোগ এই ভিটামিনের অভাবে ঘটে, এবং তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, কত প্রকারের ভিটামিন আছে ও কোন্ খাদ্যের মধ্যে কী কী শ্রেণীর ভিটামিন থাকে। আমরা উপস্থিত ছয় প্রকার ভিটামিনের অস্তিত্বের কথা জানি।

উপকরণ খাদ্য

খাদ্যকে মুখরোচক করিবার জন্য যে সকল দ্রব্য আমরা ব্যবহার করি সেগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। হলুদ, ধনিয়া, লঙ্কা, জিরা, সরিষা, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি প্রভৃতি নানাবিধ মসলা, এবং চা, কফি প্রভৃতি অবান্তর খাদ্যও এই শ্রেণীতে পড়ে। খাদ্যের আনুষঙ্গিক হইলেও এইগুলির মূল্য নিতান্ত কম নয়। খাদ্য সুস্বাদু না হইলে শরীরের প্রয়োজন থাকিলেও তাহা খাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, খাদ্যে যাহার রুচি নাই তাহাকে জারক লেবু বা কাসুন্দি প্রভৃতি দিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে

হয়, প্রকৃত খাদ্য না হইলেও উহার মূল্য সেইজন্য তখন অনেক বেশি। এই সকল উপকরণ-খাদ্য ব্যবহৃত হয় ব্যক্তিগত রুচি ও অভ্যাস অনুসারে। তবে এইগুলির যত কম ব্যবহার হয় ততই ভালো। কারণ অধিক মসলা প্রভৃতির দ্বারা পাকযন্ত্র বিকল হয় এবং খাদ্যের মূল উদ্দেশ্য তাহাতে ব্যর্থ হইতে পারে।

আমরা খাদ্যকে আপাতত ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইলাম। এইগুলির সম্বন্ধে আমরা পরে আরো বিশদ ভাবে আলোচনা করিব। উপস্থিত আমাদের দেখা প্রয়োজন যে এই সকল বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য আমরা কিরূপ ভাবে হজম করি এবং শরীরের প্রয়োজনে উহা আমরা শেষ পর্যন্ত কিরূপভাবে নিয়োগ করি।

হজম-প্রক্রিয়া

আমাদের দেশের একজন নাট্যকার একবার ডাক্তারদের সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছিলেন, আমাদের পেট তো পোস্টাফিস নয় যে, পাঁচ রকম ঔষধ একত্রে মিশাইয়া উহার মধ্যে ফেলিয়া দিতে পারিলেই পেট সেইগুলিকে বাছাই করিয়া যথাস্থানে পৌছাইয়া দিবে। কিন্তু তিনি ঠাট্টার ছলে যে উপমার প্রয়োগ করিয়াছিলেন, আমাদের পেটের ভিতরকার ক্রিয়া প্রকৃতরূপে বুঝাইবার পক্ষে এমন সুন্দর উপমা আর নাই। পোস্টাপিসে যেমন নানা ঠিকানার চিঠি ডাকবাক্সের মুখ দিয়া উহার একই গহ্বরের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তৎপরে ঐ সকল চিঠি বাছাই হইয়া রেলগাড়িতে যাইতে যাইতে ঠিকানা অনুযায়ী প্রত্যেক স্টেশনে উহার কতকগুলি করিয়া নামাইয়া দেওয়া হয় এবং অবশেষে যে সকল চিঠি কেহ গ্রহণ করিল না সেগুলিকে আবর্জনাস্বরূপ ডেডলেটার

আপিসে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়,— আমাদের পেটেও খাদ্যাদি সম্বন্ধে ঠিক ঐরূপ ব্যবস্থাই করা আছে। আমরা যে সকল খাদ্য একসঙ্গে খাইয়া থাকি তাহা বস্তুত একত্রে মিশিয়াও যায় না, এবং এক জায়গায় হজমও হয় না।

হজমের ব্যাপারটা প্রকৃত যাহা ঘটে তাহা কতক এইরূপ। খাদ্য মুখ দিয়া গলায় প্রবেশ করিবার পর যেন এক সুদীর্ঘ নল বাহিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে। ঐ নলের স্থানে স্থানে এক-একটি কারখানা, তথায় এক-একজন সজাগ রাসায়নিক অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। প্রত্যেকের এক-একটি স্বতন্ত্র প্রকারের নিজস্ব রাসায়নিক শক্তি আছে। খাদ্য পর্যায়ক্রমে যখন যাহার কারখানার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় তখনই সে আপন বিশিষ্ট শক্তি উহার উপর প্রয়োগ করে, এবং যথাকর্তব্য করিয়া তৎপরে উহাকে ছাড়িয়া দেয়। খাদ্যও এইরূপে হাত বদলাইতে বদলাইতে এক-একজন রাসায়নিকের ঘাঁটি পার হয় এবং প্রত্যেকের দ্বারা কতকটা করিয়া বিশ্লেষিত ও পাচিত হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। যে-গুলিকে আমরা রাসায়নিক বলিতেছি সেগুলি এক-একটি নির্দিষ্ট প্রকারের পাচক রস, উহা আমাদের খাদ্যনালীর ভিতরকার বিভিন্ন অংশ হইতে স্থানীয় সৃষ্টিস্বরূপ আপনি ক্ষরিত হইয়া থাকে। এইরূপ বিভিন্ন কয়েক-প্রকার পাচকরসের দ্বারা পুনঃপুনঃ রাসায়নিক সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণের ফলে খাদ্য একেবারে তরল হইয়া অবশেষে শরীরের নিজস্ব রসের মধ্যে গ্রহণ-যোগ্যরূপে রূপান্তরিত হইয়া যায়। তখন উহা খাদ্যনালীর এমন স্থানে গিয়া পৌঁছায় যেখানে নালীগাত্র দিয়া উহাকে রক্তের মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার বন্দোবস্ত আছে। খাদ্যের তরলসার তখন শোষিত হইতে হইতে আরো অগ্রসর হইতে থাকে এবং অবশেষে উহাতে আর শরীরের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

কিন্তু আমরা যাহা বলিলাম ইহাতে হজমের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিল মাত্র, নির্দিষ্ট করিয়া কিছুই বলা হইল না। তাহা বলিতে হইলে আমাদের খাদ্যনালীর বিভিন্ন অংশের ধারাবাহিক বর্ণনা করিতে হইবে এবং উহার মধ্য দিয়া একে একে খাদ্যের সহিত অগ্রসর হইয়া দেখিতে হইবে কোন্ স্থানে কিরূপ ক্রিয়া হইতেছে।

আমাদের সমগ্র খাদ্যনালী প্রকৃত পক্ষে একটিমাত্র সুদীর্ঘ নল, মুখ হইতে আরম্ভ হইয়া মলদ্বারে গিয়া শেষ হইয়াছে। ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে পৌষ্টিক-নালী। ইহা আগাগোড়া নানারূপ মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত ; কিন্তু ইহার ভিতরের দিকের ফাঁপা দেয়ালটি বরাবর ঝিল্লীর আবরণ দিয়া মোড়া এবং এই ঝিল্লীর গাত্র বাহিয়াই স্থানে স্থানে নানারূপ পাচক রস নির্গত হয়। তবে এই পৌষ্টিক-নালী সর্বত্র এক-রকমের দেখিতে নয়। কোথাও বা ইহা সরু কোথাও বা খুব মোটা, কোথাও বা অত্যন্ত ফুলিয়া ফাঁপানো থলির মতো বিস্তৃত হইয়া রীতি-মতো এক-একটি গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে, কোথাও বা অবিন্যস্ত ভাবে রবারের নলের মতো গায়ে গায়ে জড়াইয়া পাকাইয়া আছে, কোথাও আবার বাহিরের অন্যান্য যন্ত্রাদি হইতে নানারূপ সূক্ষ্ম নল আসিয়া উহার গাত্র ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। তাই এই একই পৌষ্টিক-নালীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম। মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পর্যায়ক্রমে গলনালী, অন্ননালী, পাকস্থলী, অন্ত্রনালী, মলনালী— সমস্তই উহার এক-একটি অংশ মাত্র। এই সুবৃহৎ পৌষ্টিক-নালী যদিও আমাদের শরীরের ভিতরকার একটি যন্ত্র, কিন্তু উহার মধ্যে যতক্ষণ খাদ্যবস্তু থাকে ততক্ষণ তাহা শরীরের ভিতরকার নিজস্ব সামগ্রী নয়।

খাদ্য যখন উহার ভিতর হইতে শোষিত হইয়া শরীরের নানাস্থানে প্রবেশ করিবে, তখনই উহা শরীরের মধ্যেকার বস্তু হইবে এবং

তখনই উহার ক্রিয়া হইতে পারিবে। কেবল খাদ্যই নহে, বিষ ও যতক্ষণ খাদ্যনালীর মধ্যে থাকে ততক্ষণ উহার কোনো ক্রিয়া নাই, শরীরেরও কোনো অনিষ্ট নাই। নালীর মধ্য হইতে শোষিত হইলেই উহার ক্রিয়া। স্থতরাং পেটের মধ্যে কিছু প্রবেশ করিলেই উহা শরীরের আপন খাদ্য হইল না, উহা আগে হজম হওয়া চাই।

হজমের ক্রিয়া শুরু হয় খাদ্য খাইবার অব্যবহিত পর হইতে। প্রয়োজন ভাবিয়া আমরা খাদ্য খাই না, ক্ষুধা পায় বলিয়াই খাই। সাধারণ মানুষের প্রত্যহ দুইবার কিংবা তিনবার করিয়াই এইরূপ ক্ষুধা পাওয়া স্বাভাবিক। ক্ষুধা কেমন করিয়া পায় তাহা আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারি না, সম্ভবত শরীরের প্রয়োজন স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে এবং তাহারই চেতনা ক্ষুধাস্বরূপে অভিব্যক্ত হয়। খাইবার নির্দিষ্ট সময়, খাদ্যের উপস্থিতি, উহার আঘ্রাণ এবং উহার আস্বাদ ক্ষুধার প্রক্রিয়াকে আরো উত্তেজিত করে। মানসিক উত্তেজনা বা অবসাদ ক্ষুধাকে দমন করিয়া দেয়।

মুখ

মুখ হইতেই হজমের ক্রিয়া আরম্ভ। মুখ পৌষ্টিক-নালীর প্রবেশ দ্বার, কিন্তু ইহা পৌষ্টিক-নালীর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। এখানকার প্রাথমিক ক্রিয়াগুলি যথোচিতরূপে সাধিত হইলেই তবে পরবর্তী হজমকার্য সকল স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, নচেৎ নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। মুখেই খাদ্য প্রথম দফায় কতকটা হজম হইয়া তৎপরে নিচে নামিয়া যায়, এ-কথা শুনিতে আশ্চর্য লাগে বটে, কিন্তু বাস্তবিকই মুখও আমাদের হজমের ঘর। এখানকার অনেক কাজ। আমরা যখন জল

বা অন্য কোনো তরল পানীয় চুমুক দিয়া খাই তখন তাহা মুখ অতিক্রম করিয়া গলা দিয়া পেটের মধ্যে একেবারেই নামিয়া যায়, সুতরাং তখন তাহাকে গলার নিকট পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়া ছাড়া মুখের কাজ আর কিছুই থাকে না। কিন্তু কঠিন খাদ্য সম্বন্ধে সে কথা নয়। কঠিন খাদ্য মাত্রকেই আগে মুখের ভিতর কিছুক্ষণ রাখিয়া দাঁত দিয়া চিবাইতে হইবে। অন্যান্য এমন অনেক প্রাণী আছে যাহাদের চিবাইবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না, কঠিন খাদ্য ও তাহারা না চিবাইয়াই গলাধঃকরণ করে, কিন্তু মানুষের পক্ষে প্রকৃতির সে নিয়ম নয়। মানুষের পেটের ভিতর-কার পাচক-রসও তাহাদের মতন তেজস্বী নয়। মানুষকে বত্রিশপাটি দাঁত দেওয়া আছে, উহা দ্বারা আগে খাদ্যকে চিবাইয়া দলিত কুট্টিত ও পিষ্ট করিতে হইবে, নতুবা তাহা সহজে হজম হইবে না, শুধু তাহাই নয়, চিবাইতে চিবাইতে উহা উত্তমরূপে লালা-মিশ্রিত হইতে থাকিবে এবং তদ্দ্বারা যখন উহা পিচ্ছিল ও কোমল মণ্ডের মতো হইয়া আসিবে তখনই উহা অনায়াসে গলাধঃকরণ করা সম্ভব হইবে, নতুবা গিলিতেও কষ্টবোধ হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নরম খাদ্য গিলিবার পরে প্রায় ছয় সেকেণ্ডের মধ্যেই উহা পাকস্থলীতে পৌছিয়া যায়, কিন্তু একটা কঠিন শুষ্ক বস্তু যদি আস্ত গিলিয়া ফেলা যায় (জলের সহিত নয়) তবে উহা গিলিবার পরেও পাকস্থলীতে গিয়া পৌছিতে প্রায় পনেরো মিনিট পর্যন্ত বিলম্ব হয়।

অতএব খাদ্যকে দলিত এবং গলিত করিবার জন্য আমাদের মুখের মধ্যে নানারূপ আয়োজন,— দাঁত আছে উহাকে চর্বণ করিবার জন্য, এবং মুখনিঃসৃত লালা আছে উহাকে নরম করিবার জন্য। কিন্তু হজম করাও লালার অন্যতম প্রধান কার্য, উহার মধ্যে হজম করিবার বিশিষ্ট একরূপ রাসায়নিক শক্তি আছে।

লালা

লালা মুখের মধ্যে আসে কোথা হইতে। মুখগহ্বরের দুই পাশে কতকটা দূরে দূরে তিনটি করিয়া সর্বসমেত ছয়টি লালাগণ্ড আছে। উহার মধ্যে দুই কানের নিচে থাকে দুইটি, চোয়ালের নিচে থাকে দুইটি, এবং জিহ্বার নিচে দুইটি। প্রত্যেক গণ্ড হইতে এক-একটি সরু নলী বাহির হইয়া মুখের ভিতর গিয়া গালের দুই পাশে ও জিহ্বার নিচে আসিয়া শেষ হইয়াছে। খাদ্য দৃষ্টিগোচর হইলেই কিংবা উহার আঘ্রাণ ও আস্বাদ পাইলেই লালাগণ্ডগুলি যেন তাহা জানিতে পারে, তৎক্ষণাৎ উহা হইতে লালা ক্ষরিত হইতে থাকে এবং তাহা নলী দিয়া গড়াইয়া আসিয়া মুখের মধ্যে পড়ে। এই লালা ক্ষারগুণযুক্ত। উহার মধ্যে কিছু পিচ্ছিল পদার্থ আছে ও টায়ালিন নামক একরূপ জারক-রস আছে। টায়ালিনের গুণ এই যে, উহা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। কার্বোহাইড্রেট ব্যতীত প্রোটিন প্রভৃতি অন্য কোনো জাতীয় খাদ্যের উপর টায়ালিনের কোনো ক্রিয়া নাই। সুতরাং ভাত, রুটি, আলু প্রভৃতি খাদ্য ইহার দ্বারা মুখের মধ্যেই কতক পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়। এ-কথা সত্য কিনা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এরোরুট একপ্রকার শ্বেতসার খাদ্য। উহার পালো প্রস্তুত করিয়া যদি তাহাতে কয়েক ফোঁটা টিংচার আইওডিন ফেলিয়া দেন, তবে দেখিতে দেখিতে উহাতে বেগুনি রং ধরিয়া যাইবে। কিন্তু ঐ এরোরুটের পালো কিছুক্ষণ মুখের মধ্যে রাখুন, তাহার পর উহা মুখ হইতে একটি পাত্রে লইয়া এইবার তাহাতে টিংচার আইওডিন দিয়া দেখুন, তখন আর উহাতে বেগুনি রং ধরিবে না। তাহার কারণ উহাতে আর পূর্বের সেই শ্বেতসার নাই, টায়ালিনের দ্বারা তাহা মুখের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। যাবতীয় কার্বোহাইড্রেট এইরূপে লালা-রসের টায়ালিনের দ্বারা রূপান্তরিত

হয়। ক্ষারগুণযুক্ত হইলেই তাহা উত্তম হয়, অম্লগুণযুক্ত হইলে সেরূপ হয় না। খাদ্য কিছু গরম থাকিলেও উহা উত্তম হয়। কেবল মুখে নয়, পেটের মধ্যেও অনেক লালা খাদ্যের সহিত চলিয়া যায় এবং সেখানে গিয়াও উহার ক্রিয়া হয়। এক-একটি লালাগণ্ড প্রচুর লালা নিঃসরণ করিতে পারে। প্রত্যহ আমাদের মুখে যে পরিমাণ লালা ক্ষরিত হয় উহার ওজন আসল গণ্ডগুলির ওজন হইতে প্রায় দশগুণ বেশি।

জিহ্বা

মুখের ভিতরকার আর-একটি যন্ত্রের ক্রিয়া এখনো কিছু বলা হয় নাই। উহা জিহ্বা। জিহ্বার একটি কার্য বাক্য উচ্চারণ করা। খাদ্য সম্বন্ধে উহার অপর কার্য,— চিবাইবার সুবিধার জন্য খাদ্যকে এদিক ওদিক হইতে সরাইয়া দাঁতের কাছে আনিয়া দেওয়া এবং চর্বণ শেষ হইলে তাহা গলার ভিতর ঠেলিয়া পাঠাইয়া দেওয়া। কিন্তু হজম সম্বন্ধে জিহ্বার প্রধান কাজ আস্বাদ অনুভব করা। জিহ্বার উপরে কতকগুলি গোটা গোটা দানা দেখা যায়, সেইগুলি উহার আস্বাদন স্থান। আস্বাদের বৃত্তিটি দান করিয়া প্রকৃতি আমাদের ভোজন-বিলাসের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে এবং উহার দ্বারা আমাদের অনেক সূক্ষ্মানুভূতির আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। উহার দ্বারা আমরা সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্যকে গ্রহণ করি এবং বিস্বাদযুক্ত হানিকর খাদ্যকে বর্জন করি। কিন্তু হজমের দিক দিয়াও ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। যখন খাদ্য পাকস্থলীতে গিয়া পৌঁছায় নাই তখন হইতেই কেবল জিহ্বার আস্বাদের খবর পাইয়া তথায় পাচক-রস ক্ষরিত হইতে আরম্ভ হয় এবং জিহ্বার আস্বাদ-স্থান হইতে স্নায়ুর উত্তেজনার দ্বারাই ইহা ঘটে। এইজন্য খাদ্য আমাদের রুচিসংগত হইলেই উহা শীঘ্র হজম হইয়া যায়,— যে খাদ্য যাহার পক্ষে

অপ্রিয় উহা তাহার পেটে গিয়া হজম হইতে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত করে। সুতরাং আস্বাদ কেবলমাত্র বিলাস নয়, হজমের পক্ষেও উহা যথেষ্ট সহায়ক। চর্বণও এই আস্বাদের সহায়ক, যতই চিবাই ততই খাদ্যের আস্বাদ উত্তমরূপে অনুভব করি।

দেখা যাইতেছে মুখের কাজ অনেক। এখান হইতে খাদ্য রীতিমতো হজমের উপযোগী হইয়া নিচে নামিয়া যায় এবং হজমের কাজও এখান হইতেই কতকটা শুরু হইয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই মুখের কাজগুলি প্রকৃতি আমাদের ইচ্ছাধীন করিয়া দিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করিলেই এখানকার ক্রিয়া দ্রুত অথবা বিলম্বিত করিতে পারি, এবং তাহা আমাদের জ্ঞাতসারেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পৌষ্টিক-নালীর পরবর্তী হজমের অন্যান্য ক্রিয়াগুলি কোনোটিই আর আমাদের জ্ঞাতসারে ঘটে না এবং উহার কোনোটিই আর আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। আজ-কালকার ব্যস্ততার যুগে যখন আমরা নাইবার খাইবার সময় পাই না, তখন এই মুখের কাজগুলিও আমাদের ইচ্ছাধীন না রাখিয়া প্রকৃতি যদি তাহাও আমাদের অজ্ঞাতসারেই ঘটাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে পারিত, তবে আর আমাদের চর্বণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন হইত না। সম্ভবতঃ দাঁতের ক্রিয়াটি অজ্ঞাতসারে চুকাইয়া লইবার কোনোরূপ সুবিধা করা যায় নাই।

গলনালী

যাহা হউক, খাদ্য মুখ হইতে অতঃপর গলাধঃকৃত হইয়া আমাদের চেতনরাজ্যের সীমানা পার হইয়া অচেতন রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইল। জিহ্বামূলই উহার শেষ সীমা। তথা হইতে গলার মধ্যে একবার প্রবেশ করিলেই উহা আমাদের অনুভূতির অন্তরালে চলিয়া গেল। গলা

বলিতে আমরা বুঝিব গলনালী। মুখগহ্বরের পশ্চাতেই ইহা কতকটা থলির মতো স্থান। জিহ্বামূল এবং উহার নিকটস্থ অনেকগুলি মাংস-পেশীর জটিল প্রক্রিয়ার দ্বারা খাদ্য ইহার মধ্যে নির্বিবাদে প্রবেশ করিতে পারে, নতুবা ভুলপথে শ্বাসযন্ত্রের দিকে যাইতে গেলেই আমাদের বিষম লাগে।

অন্ননালী

অল্পপরিসর স্থানকেই আমরা গলনালী বলি। ইহার পরেই যে খাদ্যবাহী নলটি গলা হইতে নামিয়া বক্ষোদেশের মধ্য দিয়া পেট পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, উহাকে আমরা বলি অন্ননালী। ইহা বৃত্তাকার মাংস-পেশীর দ্বারা প্রস্তুত একটি ফাঁপা নল, লম্বায় প্রায় দশ ইঞ্চি, ভিতরের ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চি। খাদ্য ইহার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে আপন ভারে নয়, কেবলমাত্র মাংসপেশীসমূহের তাড়নায়। এখানকার মাংসপেশীগুলির এমনই বন্দোবস্ত যে উপরের মাংসপেশী সংকুচিত হইলেই তাহার অব্যবহিত নিচেকার মাংসপেশী শিথিল হইয়া স্ফীত হইয়া যাইবে, পরস্পরের মধ্যে স্নায়ুর যোগাযোগের দ্বারা এইরূপ ক্রিয়াপারম্পর্যের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং ঢোক গিলিবার পর যেমনি এক তাল খাদ্য এই নালীর মধ্যে প্রবেশ করে, তৎক্ষণাৎ উহার পিছনের মাংসপেশী সংকুচিত হইয়া নালীর ব্যাস সরু হইয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার সুমুখের মাংসপেশী শ্লথ হইয়া তথাকার ব্যাস বাড়িয়া যায়। এইরূপ পর্যায়ক্রমে মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা পিছন দিক হইতে ঠেলা পাইয়া এবং সুমুখদিকে খোলা রাস্তা পাইয়া খাদ্যের তালটি অগ্রসর হইতে থাকে। বস্তুত পৌষ্টিক নালীর সমস্ত পথটাই এইরূপ মাংসপেশীর প্রক্রিয়ার দ্বারা খাদ্যসমূহ গলা হইতে শুরু করিয়া মলদ্বার পর্যন্ত ক্রমশ

অগ্রসর হইয়া যায়, কিন্তু চেতনার অধিকারভুক্ত নয় বলিয়া আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারি না। এইরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়াই অন্যান্য জন্তুরা মুখ নিচু করিয়া খাদ্য খাইতে ও জল পান করিতে পারেএবং ইচ্ছা করিলে আমরাও তাহা পারি। পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে, নিচের দিকে মাথা এবং উপর দিকে পা করিয়াও কিছু গিলিয়া খাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন নয়। অন্ননালীর মধ্যে কোনো বস্তু একবার গিয়া পড়িলেই মাংসপেশীগুলি নিশ্চয় উহাকে ঠেলিয়া নিচের দিকে পৌঁছাইয়া দিবে। অজ্ঞান অবস্থাতেও ইহা ঘটিবে। সেইজন্য ক্লোরোফর্ম করিয়া অপারেশন করিবার সময় আমাদের বিশেষ সাবধান হইতে হয় যেন কোনো যন্ত্রাদি ভুলক্রমে গলার মধ্যে প্রবেশ না করে, কারণ যাহাই একবার প্রবেশ করিবে তাহা আর বাহির করা যাইবে না, নিশ্চিত পেটের ভিতর ক্রমশ চলিয়া যাইতে থাকিবে।

পাকস্থলী

অন্ননালী পার হইয়া খাদ্য ঢুকিল পাকস্থলীতে। এইখানে আসিয়া খাদ্য কিছুক্ষণের জন্য আটক হইয়া থাকিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পাকস্থলীর নির্দিষ্ট পরিপাক ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উহা এখান হইতে ছাড়া পাইবে না ; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পাকস্থলী পুনরায় শূন্য হইয়া না যায় ততক্ষণ "ভরাপেটের" অবস্থা, ঐ সময় আবার কিছু উহার মধ্যে চাপাইয়া দেওয়াও যুক্তিযুক্ত হইবে না। কতক্ষণ যে খাদ্য পাকস্থলীতে আটক থাকিবে তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই, খাদ্যের গুরুত্ব অনুসারে উহা এক ঘণ্টাও হইতে পারে, চার পাঁচ ঘণ্টাও হইতে পারে, পরিপাক শক্তি দুর্বল হইলে তাহার অধিকও হইতে পারে। কিন্তু জলের সম্বন্ধে এ নিয়ম নয়। খাদ্যের সঙ্গে জল খাইলে তখন উহা খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত

হইয়াই থাকিয়া যায়, কিন্তু খালিপেটে জল পান করিলে উহা পাকস্থলীতে আদৌ অবস্থান করে না, দুই তিন মিনিটের মধ্যেই এই স্থান অতিক্রম করিয়া নিচের অন্ত্রে চলিয়া যায়। আরো এক কথা, নিজ পাকস্থলী হইতে কোনো খাদ্যই শোষিত হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে না, এমন কি জলও না, অনেক বিষও না। সেইজন্য আফিম প্রভৃতি বিষ খাইবার কিছুক্ষণ পরেও যদি উহা পাম্প করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া যায় তবে রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পায়। কেবলমাত্র দুটি জিনিস পাকস্থলীর মধ্য হইতেই সরাসরি শোষিত হইয়া যাইতে পারে— সুরা, এবং কিছু কিছু লবণাদি। সুতরাং পাকস্থলী খাদ্যকে কেবল আংশিক-ভাবে হজম করিয়া নিচে পাঠাইয়া দিবার যন্ত্র মাত্র। পাকস্থলী কাটিয়া বাদ দিলেও তাই আমাদের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব। পরিপাকের প্রধান কার্যগুলি অন্ত্রের মধ্যেই হয়, পাকস্থলীতে তাহার সূচনা মাত্র হয়।

কিন্তু পাকস্থলীতে খাদ্য আটক হইয়া থাকেই বা কিরূপে, এবং পরে কিরূপেই বা উহা নির্গত হয়। ইহা বুঝিতে হইলে যন্ত্রটির সম্বন্ধে কিছু বিশেষ পরিচয় জানা আবশ্যক। ইহা দেখিতে ভিস্তির মশকের মতো একটি ফাঁপা থলি। উদরগহ্বরের উপরাংশে আড়ভাবে লম্বমান, তিন পাইণ্ট বা আন্দাজ দেড় সের বস্তু ইহার মধ্যে এককালে ধরিতে পারে। ইহার দুই মুখ,— বামে এক মুখ, যেখানে অন্ননালী আসিয়া শেষ হইয়াছে, উহার নাম আগম-দ্বার; আর দক্ষিণে এক মুখ, যেখান হইতে অন্ত্রনালী আরম্ভ হইয়াছে, উহার নাম নিগম-দ্বার। ইহা কেবল মাংসপেশীর দ্বারাই নির্মিত, ভিতরে থাকে ঝিল্লীর আবরণ। এই ঝিল্লীগাত্রে অসংখ্য ছোটো ছোটো গণ্ডসমূহ আছে, তাহা হইতেই পাচকরস ক্ষরিত হয়। শূন্য অবস্থায় পাকস্থলী কিছু সংকুচিত হইয়া থাকে কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, উহার মধ্যে সর্বদাই কিছু পরিমাণ বায়ু থাকে।

খাদ্যের চাপ পড়িলে তখন পাকস্থলী বিস্তৃত হইয়া যায় এবং খাদ্যের পরিমাণ বেশি হইলে ভিতরের বায়ু উপর দিকে নির্গত হইয়া যায়। উহাকেই আমরা ঢেকুর তোলা বলি।

খাদ্য ভিতরে প্রবেশ করিবার পরে পাকস্থলী-গাত্রের মাংস-পেশীগুলি এমনভাবে উপর্যুপরি কুঞ্চিত হইতে থাকে যেন উহার গাত্রে বামদিক হইতে ডানদিকে অনবরত ঢেউ বহিয়া যাইতেছে। এই সংকোচনক্রিয়ার দ্বারা ভিতরের খাদ্য উত্তমরূপে মন্থিত হইতে থাকে। কিন্তু এইরূপ চাপ পাইয়াও খাদ্যের কণামাত্র তখন অন্ত্রে মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, কারণ নিগমদ্বারটি তখন থাকে কঠিনরূপে আবদ্ধ, পাকস্থলীর ক্রিয়ার শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই উহা খুলিবে না। কেবলমাত্র জল প্রবেশ করিলে উহা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া যাইবে, কিন্তু খাদ্য প্রবেশ করিলে উহা পরিপাক হইবার পূর্বে নয়। যেন কোনো সতর্ক প্রহরী ঐখানে বসিয়া আছে, খাদ্য পাকস্থলীর ছাড়পত্র না দেখাইলে কিছুতেই উহাকে ছাড়িবে না। ইহার জন্য এক ঘণ্টা মাত্রও বিলম্ব হইতে পারে, আবার দশ ঘণ্টাও বিলম্ব হইতে পারে,—তাহা খাদ্যের গুরুত্ব এবং কাঠিন্যের উপর নির্ভর করে। খাদ্য যদি লঘুপাক হয় এবং উহা উত্তমরূপে চর্বিত হইয়া নরম অবস্থায় পাকস্থলীতে যায়, তবে তথাকার পাচকরসের যাহা কার্য তাহা শীঘ্রই শেষ হইয়া যায় এবং খাদ্যও অল্প অল্প করিয়া তথা হইতে ছাড়া পায়। কিন্তু উহা যদি কঠিন হয় এবং না-চিবাইয়া তাড়াতাড়ি উহা কোঁৎ কোঁৎ করিয়া গিলিয়া ফেলা হয়, তবে উহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যতটুকু পরিপাক করিবার তাহা করিতে পাকস্থলীর বিলম্ব হইয়া যায়, ততক্ষণ নিগম-দ্বারটি রুদ্ধ হইয়াই থাকে। যদি খাদ্য এমন হয় যে তাহাও সম্ভব নয়, তখন পাকস্থলী উহা বমন করিয়া বাহির করিয়া দেয়। গুরুভোজন করিলে আমরা

অম্লবোধ করি, অম্লের উদ্গার ওঠে, তখন বলি অম্লাধিক্য হইয়াছে। তাহার প্রকৃত কারণ কিন্তু আর কিছুই নয়,— নিগম-দ্বার খুলিতেছে না অথচ পাকস্থলীর মন্থন চলিতেছে, এদিকে অম্লাস্বাদযুক্ত পাচকরস খাদ্যের উপস্থিতিহেতু ক্রমাগতই নির্গত হইতেছে, তাহাই খোলাপথ না পাইয়া উপরদিকে ঠেলিয়া আসিতে চায়, এবং ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

এখন দেখা যাক পাকস্থলীর হজম সম্বন্ধীয় ক্রিয়াগুলি কী। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, খাদ্যের দর্শন এবং আস্বাদ মাত্রেই এখানে পাচকরস নির্গত হইতে শুরু হয়। খাদ্য প্রবেশ করিবার পাঁচ মিনিট পর হইতে উহা আরো উত্তমরূপে হইতে থাকে। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ রস নির্গত হইতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগে। ততক্ষণ পর্যন্ত খাদ্য লালামিশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে এবং লালামধ্যস্থ টায়ালিনের ক্রিয়া উহার কর্বোহাইড্রেটগুলির উপর তখনও চলিতেছে। অতঃপর পাচকরসের উপস্থিতিতে লালার গুণ নষ্ট হইয়া যায়,— কারণ এই রস অম্লধর্মী, আর লালা ক্ষারধর্মী। পাচকরসের নিজস্ব ক্রিয়া কার্বোহাইড্রেটের উপর কিছুই নাই। উহার ক্রিয়া কেবল মাংস মৎস্যাদি প্রোটিন খাদ্যের উপর এবং ঘৃত তৈলাদি স্নেহপদার্থের উপর। সুতরাং কার্বোহাইড্রেটের হজম আপাততঃ স্থগিত হইয়া ঐ সকল খাদ্যের উপরেই পাচকরসের ক্রিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং তাহা যতই ঐ সকল খাদ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে ততই সেগুলি রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা বিশ্লিষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত সরল তারল্যের অবস্থায় পরিণত হয়। এইখানেই পোস্ট আপিসের মতো খাদ্যগুলিকে ভাগ করিয়া লইয়া স্বতন্ত্রভাবে হজমের ব্যবস্থা করা শুরু হইল। পাচক-রসের মধ্যে তিন প্রকারের রাসায়নিক জারক পদার্থ আছে। একটির নাম পেপসিন— উহা প্রোটিন খাদ্য মাত্রকেই বিশ্লিষ্ট করিয়া অপেক্ষাকৃত সরল পেপটোনের

অবস্থায় পরিণত করে দুধও প্রোটিন খাদ্য, তরল হইলেও উহা ছানা কাটিয়া পেটের ভিতর গিয়া কঠিন খাদ্য হইয়া যায় এবং ঐ ছানাকেও ইহা কতক হজম করে। আর-একটি জারক পদার্থ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড,—ইহা পেপসিনের ক্রিয়াকে সাহায্য করে, এবং ইহা উত্তম বীজাণু-নাশক। তৃতীয়টির নাম লাইপেজ, উহা ঘৃতাদিকে কতক হজম করে।

পাকস্থলীর কারখানাঘরে খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ কতটুকু হয় তাহা আমরা দেখিলাম। (১) এখানে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য টায়ালিনের দ্বারা কতক হজম হয়, (২) প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের হজম শুরু হয়, (৩) দুধের ছানা কাটিয়া যায়, (৪) চর্বি ও তৈলাদি কতক বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, এবং (৫) খাদ্যের সহিত কোনো বীজাণু প্রভৃতি থাকিলে অ্যাসিডের দ্বারা তাহা বিনষ্ট হয়। অতএব সকল প্রকার খাদ্যের হজমের কিছু কিছু সূত্রপাত মাত্র এখানে হইল, সম্পূর্ণ করিয়া কিছুই এখানে হজম হইল না। কিন্তু এই সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এবং মাংসপেশীসমূহের দ্বারা মন্থিত হওয়ার ফলে খাদ্যগুলি গলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া ঘন মাড়ের মতো পাকমণ্ডে পরিণত হইয়া অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল।

অন্ত্রনালী

পাকস্থলীকে ছাড়িয়া এইবার অন্ত্রের কথা বলিতে হইবে। ইহাই মূল হজমের যন্ত্র। অন্ত্রের দুই ভাগ,— ক্ষুদ্র অন্ত্র ও বৃহৎ অন্ত্র। কিন্তু বাস্তবিক উহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আর একটি বৃহৎ নয়, ক্ষুদ্র অন্ত্রের নালী দেখিতে সরু এবং বৃহৎ অন্ত্র তদপেক্ষা মোটা। ক্ষুদ্র অন্ত্র পাকস্থলীর নিগম-দ্বার হইতে আরম্ভ হইয়া পেটের ভিতর জড়াইয়া পাকাইয়া

অবশেষে তলপেটের দক্ষিণ-দিকে একটি সংকুচিত মুখে অর্থাৎ কপাটিকাতে আসিয়া শেষ হইয়াছে, এবং বৃহৎ অন্ত্র তথা হইতে আরম্ভ হইয়া উদরগহ্বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া মলদ্বারে আসিয়া শেষ হইয়াছে। অতএব আগে ক্ষুদ্র অন্ত্রের কথা, তৎপরে বৃহৎ অন্ত্রের কথা।

ক্ষুদ্র অন্ত্র

ক্ষুদ্র অন্ত্র এক অতি দীর্ঘ মাংসপেশীর নল, মাপে প্রায় একুশ ফুট লম্বা এবং এক ইঞ্চি চওড়া। এত দীর্ঘ হইলেও উহা উদর-গহ্বরের অল্পপরিসর স্থানের মধ্যে জড়াইয়া পাকাইয়া থাকে, এবং চলিত কথায় ইহাকেই আমরা আঁৎ কিংবা নাড়ীভুঁড়ি বলি; ইহার প্রথম অংশটি ছাতার বাঁটের মতো বাঁকানো এবং মাপেও প্রায় তদ্রূপ, এটুকুর নাম ডুয়োডিনাম। খাদ্য ইহার মধ্য দিয়া অতি ধীরে ধীরে এবং প্রত্যেক পাকে পাকে থামিয়া থামিয়া অগ্রসর হয়। ইহার গাত্রস্থ মাংসপেশীগুলির ক্রিয়াও পূর্বোক্ত প্রকার নিম্নগামী ঢেউয়ের ন্যায় সংকোচনের দ্বারা। এই সংকোচন ক্রিয়া যদি কখনো কোনো কারণে বাধা পায় এবং উহার বেগ নিচের দিকে অগ্রসর হইতে না পারিয়া উপর দিকে ঠেলিয়া আসে, তখনই পেটে নানারূপ বিপর্যয় উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথমার্ধ অংশের দ্বারা প্রধানতঃ খাদ্যগুলি হজম হয়, এবং শেষার্ধ অংশের দ্বারা খাদ্যের হজমীকৃত সারপদার্থগুলি শোষিত হইয়া রক্তমধ্যে প্রবেশ করে। বলা বাহুল্য উহার ভিতরকার ঝিল্লী-গাত্রের দ্বারাই এই সকল হজম ও শোষণ ক্রিয়া সাধিত হয়।

খাদ্যের সমস্তটাই একেবারে পাকস্থলী হইতে অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে না। খাইবার এক ঘণ্টা পর হইতে তিন চারি ঘণ্টা অবধি উহা একটু একটু করিয়া দফায় দফায় অন্ত্রে প্রবেশ করিতে থাকে। প্রবেশ করিবার

সঙ্গে সঙ্গে উহাকে হজম করিবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে কয়েক প্রকার পাচকরস আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়। যেরূপে ঐ সকল রস ঠিক সময়মতো আসিয়া পৌছায় তাহার কাহিনী অতি কৌতূহলজনক। প্রথমে খাদ্য প্রবেশ করিলে ডুয়োডিনমের গাত্র হইতে একটি আভ্যন্তরিক রস বাহির হয়, উহার নাম সিক্রিটিন। উহা বার্তাবহ রস, তৎক্ষণাৎ উহা রক্তের মধ্য দিয়া যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়, এবং উহাদিগকে আপন আপন পাচকরস প্রেরণ করিতে উত্তেজিত করে। যকৃৎ কাহাকে বলে তাহাও আমরা জানি এবং উহা হইতে যে পিত্ত নির্গত হয় তাহাও আমরা জানি। অনেক সময় আহারের কাল অনুসারে পিত্ত আপনি নির্গত হয়, কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলে তখন উহা যকৃৎ হইতে বাহির হইয়া স্বতন্ত্র পিত্তথলির মধ্যে জমিয়া থাকে। খাদ্য অন্ত্রে পৌছিলে তখন পিত্ত আরো অধিক মাত্রায় নির্গত হইতে থাকে এবং সরাসরি একটি নল বাহিয়া অন্ত্রে প্রবেশ করিতে থাকে। অগ্ন্যাশয়ও ঐরূপ আর-একটি যন্ত্র, পাকস্থলীর পিছনে আড়ভাবে লম্বমান থাকে, আকারে প্রায় সাত ইঞ্চি লম্বা। যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় দুইই এক জাতীয় গণ্ডমাত্র, গঠনে লালাগণ্ডেরই অনুরূপ, খাদ্যের আগমন-সংবাদ পাইলেই উহারা পাচকরস ক্ষরণ করে। অগ্ন্যাশয়েরও একটি রসবাহী নল আছে, যকৃতের নলের সহিত তাহা একত্রিত হইয়া ডুয়োডিনমে গিয়া উন্মুক্ত হয়।

অতএব খাদ্য প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই পিত্ত এবং অগ্ন্যাশয় রস অন্ত্রে গিয়া উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে অন্ত্রগাত্র হইতেও একপ্রকার আন্ত্রিকরস নির্গত হইয়া উহার সহিত মিলিত হইল। এই তিন প্রকার রস তিন দিক হইতে খাদ্যকে আক্রমণ করিল এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সমস্ত প্রকার খাদ্যকে একে একে হজম করিতে লাগিল।

তিন প্রকার রসের মধ্যে অগ্ন্যাশয় রসের শক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক, উহার মতো তেজস্কর খাদ্যজারক একটিও নাই। ইহার মধ্যে (১) সোডা ক্ষার আছে, তাহা পাকস্থলী হইতে আগত খাদ্যের অম্লত্ব নষ্ট করে। খাদ্যে অম্লগুণ না জন্মিলে যেমন পাকস্থলীর পাচকরসের ক্রিয়া হয় না, তেমনি ক্ষারগুণ না জন্মিলে অন্ত্রস্থ রসগুলির ক্রিয়া হয় না। এ ছাড়া অগ্ন্যাশয় রসের মধ্যে আছে (২) ট্রিপসিন, তাহা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য মাত্রকেই উত্তমরূপে পরিপাক করে। আর আছে, (৩) অ্যামাইলেজ, তাহা কার্বোহাইড্রেট খাদ্যকে হজম করিতে টায়ালিন অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী, কাঁচা চালকেও ইহা হজম করিতে পারে। আর আছে (৪) লাইপেজ, ইহা ঘি তৈল প্রভৃতিকে হজম করে পিত্তের সাহায্যে। সুতরাং এই অগ্ন্যাশয় রসই হজমের অনেক কাজ সারিয়া ফেলে। তবে ইহার একার দ্বারা সমস্ত হজমের কাজ সম্পূর্ণ হয় না, তাহা হয় পিত্তের এবং আন্ত্রিক রসের ইরেপসিন নামক জারকের সাহায্যে। শেষোক্ত জারকটির সাহায্যে প্রোটিনগুলি অবশেষে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়, এবং তাহাই রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। এদিকে কার্বোহাইড্রেটও গ্লুকোজে পরিণত হইয়া রক্তের মধ্যে গ্রহণের উপযোগী হয়।

খাদ্যের সমস্তগুলিই হজম হইল, এইবার তাহা শোষিত হইবে ক্ষুদ্র অন্ত্রের শেষার্ধের গাত্র দিয়া। এখানকার ভিতরের দিকের ঝিল্লী দেখিতে মখমলের মতো, উহাতে পশমের মতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুঁয়া আছে। লেন্সের সাহায্যে দেখা যায় যে, এই শুঁয়াগুলি এক-একটি যেন আঙুলের মতো। ঐগুলির নাম ভিলাই। ইহার প্রত্যেকটির উপরের দিকে থাকে রক্তশিরা, ভিতরদিকে ঝিল্লী। খাদ্যের সার পদার্থ ইহার গাত্র দিয়াই একে-একে ঝিল্লী হইতে সরাসরি উহার রক্তশিরায় প্রবেশ করে। অন্ত্রে খাদ্য প্রবেশ করিবার তিন চারি ঘণ্টার মধ্যেই এই কার্য সমাধা হইয়া যায়।

বৃহৎ অন্ত্র

অতঃপর খাদ্য গ্রহণ করিবার প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর হইতে উহা ক্ষুদ্র অন্ত্র ত্যাগ করিয়া বৃহৎ অন্ত্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। বৃহৎ অন্ত্র প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ, প্রায় চার ইঞ্চি চওড়া। ইহার ভিতরের ঝিল্লীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড আছে, তাহা হইতে আম নিঃসৃত হয়। ইহার মাংসপেশীতেও সংকোচন ক্রিয়া আছে, উহার গতি মন্থর। খাদ্যের হজমাবশিষ্ট আবর্জনাগুলি এই পথ অতিক্রম করিতে বারো ঘণ্টারও অধিক সময় লইয়া থাকে। বৃহৎ অন্ত্রের গাত্র দিয়া কতক জল এবং কিছু কিছু লবণ ও গ্লুকোজ শোষিত হয়, কিন্তু বৃহৎ অন্ত্রের কোনো হজম সম্পর্কীয় ক্রিয়া নাই।

খাদ্যের অবশিষ্ট পদার্থগুলি এখানে আসিয়া প্রবেশ করিলেই উহার নাম মল। কিন্তু প্রথমে উহা অত্যন্ত তরল, উহাতে প্রায় নব্বুইভাগই জল। এই জল বৃহৎ অন্ত্রের গাত্র দিয়া ধীরে ধীরে শোষিত হইতে থাকে এবং ক্রমে মল অপেক্ষাকৃত কঠিন হইতে থাকে। উদরাময় হইলে উহা কঠিন হইবার সুযোগ পায় না, তাড়াতাড়ি জলসমেত নিষ্কাশিত হইয়া যায়। বৃহৎ অন্ত্রের মধ্যে অধিকন্তু থাকে অসংখ্য জীবাণুদের বসবাস। উহারাই মলকে পচায়, এবং মল খাইয়াই উহাদের পুষ্টি ও সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আমরা যে সকল শাক ডাঁটা খাই তাহা জীর্ণ না হইয়া এইখানে আসিয়া পচে এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অন্যান্য যে সকল খাদ্য হজম হয় না তাহাও এইখানে আসিয়া পচে এবং তাহা হইতে গ্যাস উৎপন্ন হয় ও বায়ুরূপে নিঃসৃত হয়। কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের গ্যাস সাধারণত গন্ধবিহীন, প্রোটিন খাদ্যের গ্যাস্ দুর্গন্ধযুক্ত।

যে মল আমরা অবশেষে ত্যাগ করি তাহা কতকটা কঠিন, আম-

মিশ্রিত, ও পিত্তের দ্বারা রঞ্জিত, কিন্তু তাহার মধ্যে কেবল খাদ্যের আবর্জনাই থাকে না, বহুসংখ্যক মৃত ও জীবিত বীজাণু উহার সহিত মিশ্রিত থাকে। যত মল নির্গত হয় তাহার মধ্যে প্রায় অর্ধেক থাকে খাদ্যাবশিষ্ট আবর্জনা এবং বাকি অর্ধেক বৃহৎ অন্ত্রস্থ বীজাণু। বহুদিন যাবৎ অভুক্ত থাকিলে অথবা কেবল জলীয় পদার্থ খাইয়া থাকিলেও যে প্রত্যহ স্বাভাবিক মতো কঠিন মল নির্গত হয়, তাহার কারণই এই, বীজাণুর দ্বারাই নিত্য ঐ মল জন্মায় এবং তাহার দুর্গন্ধও ঐ বীজাণু হইতে। বীজাণুর বাসা স্বরূপ এই বৃহৎ অন্ত্র যদি আমাদের না থাকিত তবে মলের পরিমাণও কমিয়া যাইত, এবং উদরাময়, আমাশয়, কোষ্ঠ-কাঠিন্য প্রভৃতি নানারূপ রোগেও আমাদের ভুগিতে হইত না। বৃহৎ অন্ত্রকে বাদ দিয়াও আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি, উহার অভাবে শরীরের কোনো অনিষ্ট হয় না। বরং উহা থাকাতেই অনিষ্ট। উহাতে প্রায়ই কোষ্টবদ্ধতা জন্মায় এবং নিচেকার পথ খোলা না থাকায় উপরকার পথেও নবপ্রবিষ্ট খাদ্যাদি অগ্রসর হইতে বাধা পায়, তাহাতেই যত প্রকার পেটের রোগ ও ডিসপেপসিয়ার সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিকেরা কেহ কেহ বলেন যে, পূর্বেকার অসভ্য যুগে যখন আমাদের অনেক অসার খাদ্য খাইয়া জীবনধারণ করিতে হইত, তখন ঐ অসার পদার্থগুলিকে ধারণ করিবার জন্য বৃহৎ অন্ত্রের আবশ্যক ছিল। কিন্তু এখনকার যুগে খাদ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে, অসার খাদ্য আর মোটেই খাইতে হয় না, সুতরাং গোরু ঘোড়ার মতো আমাদের বৃহৎ অন্ত্রের এখন আবশ্যক নাই।

আজ যে খাদ্য খাইলাম, কাল চব্বিশ ঘণ্টা পরে তাহার মল নির্গত হইয়া যাইবার কথা। কিছু বিলম্ব হইলেও ত্রিশ ঘণ্টা পরে উহার অবশিষ্ট আর কিছু পেটের মধ্যে থাকে না। ঐ মল পূর্ব হইতেই

মলাশয়ে আসিয়া জমিয়া থাকে এবং প্রত্যহ একবার বা দুইবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে বেগ উপস্থিত হয়। তখন স্নায়বিক উত্তেজনায় বৃহৎ অন্ত্র কুঞ্চিত হইতে থাকে ও মলগুলি বাহির হইয়া যায়।

হজমের পর খাদ্যের পরিণাম

প্রবাদবাক্যে বলিয়া থাকে—

"মাংসে মাংস বৃদ্ধি, অন্নে বৃদ্ধি বল,
দুগ্ধে লাবণ্য বৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল।"

আমরা এ পর্যন্ত জানি যে, খাদ্য মাত্রই হজম হইয়া তরল অবস্থায় রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। কিন্তু তাহার পর ঐ সকল খাদ্যের পরিণাম কী হয়। উপরি-উক্ত প্রবাদবাক্যই এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দিবে। বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যের বিভিন্নরূপ পরিণাম। মাংসজাতীয় প্রোটিন খাদ্যে মাংসাদি তাবৎ শরীরবস্তু গঠিত হয়, অন্ন প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট খাদ্যে শরীরের কর্মশক্তি উৎপাদিত হয়, এবং দুধ, ঘি ও তেল প্রভৃতি স্নেহজাতীয় খাদ্যে মেদ উৎপন্ন হইয়া শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি করে। যেরূপ প্রক্রিয়ায় তাহা ঘটিয়া থাকে উহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলে মেটাবলিজম্ অর্থাৎ পরিণতিক্রিয়া।

প্রোটিনের পরিণতি

খাদ্যের মেটাবলিজম্ বা পরিণতি-ক্রিয়া এক প্রকারের নয়। প্রধানতঃ উহা তিন প্রকারের, অর্থাৎ তিন দিক দিয়া তিন রকম ভাবে উহা আমাদের সমগ্র শরীরযন্ত্রকে কর্মক্ষম এবং জীবন্ত করিয়া রাখে। উহার একরূপ হইতেছে প্রোটিন মেটাবলিজম্, যাহার দ্বারা শরীরস্থ প্রত্যেকটি

স্বতন্ত্র কোষে কোষে নাইট্রোজেন সরবরাহ করিয়া সেইগুলিকে নিত্য বাঁচাইয়া রাখা হয়, নতুবা কোনো কোষই বাঁচিতে পারে না। প্রোটিন খাদ্যসমূহ হজম হইয়া অবশেষে যে অ্যামিনো-এ্যাসিডগুলি রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, উহা হইতেই এই নাইট্রোজেন গৃহীত হয়।

আমাদের উদরস্থ অন্ত্রসমূহের সমস্ত রক্তশিরাগুলি একত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে একটি সুবৃহৎ রক্তশিরায়, উহার নাম পোর্টাল শিরা। এই শিরা যকৃতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শেষ হইয়াছে এবং তথা হইতে যকৃতের অন্য একটি নিজস্ব শিরা বাহির হইয়া হৃৎপিণ্ডে গিয়াছে। অতএব পূর্বোক্ত অ্যামিনো-অ্যাসিডগুলি অন্ত্র হইতে রক্তে প্রবেশ করিয়া প্রথমে পোর্টালরক্তশিরা বাহিয়া যকৃতের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়, এবং তৎপরে তথা হইতে হৃৎপিণ্ডে গিয়া শরীরের সমস্ত রক্তমধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। সেইজন্য প্রোটিন খাদ্য খাইবার কিছুক্ষণ পরে যে কোনো স্থানের রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা যায় যে উহাতে অ্যামিনো-অ্যাসিডের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আরও কিছুক্ষণ পরে পুনরায় রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, অ্যামিনো-অ্যাসিডের পরিমাণ এখন অনেক কম। ইহার কারণ কী। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ এবং তথাকার প্রত্যেক কোষটি বহমান রক্ত হইতে নিজের প্রয়োজন মতো অ্যামিনো-অ্যাসিড আহরণ করিয়া লইয়াছে। এই অ্যামিনো-অ্যাসিড লইয়া প্রত্যেক কোষটি উহাকে পুনরায় আপন অঙ্গের অনুরূপ প্রোটিনের অবস্থায় রূপান্তরিত করিয়া তদ্দ্বারা আপনার পুষ্টিসাধন করে। সুতরাং যাহা প্রথমে প্রোটিন ছিল, তাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া অ্যামিনো-অ্যাসিড হইল, আবার সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রোটিন হইল। ইহার প্রয়োজন কী। প্রয়োজন এই যে, শরীরস্থ প্রত্যেক অঙ্গের স্থানীয় প্রোটিন বিভিন্ন প্রকার, সুতরাং খাদ্যের বিজাতীয় প্রোটিনকে বিশ্লিষ্ট অবস্থায় না পাইলে

উহাকে বিভিন্ন কোষগুলি নিজ নিজ অঙ্গ-স্বরূপ করিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ইহার জন্য শরীরের যতটুকু অ্যামিনো-অ্যাসিডের প্রয়োজন ততটুকু সে লইবে, তাহার অধিক লইবে না। এদিকে কিন্তু আমরা প্রোটিন খাদ্য মাপিয়া খাই না, শরীরের গঠনকার্যের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সাধারণতঃ তাহার অধিকই খাইয়া থাকি। সুতরাং অ্যামিনো-অ্যাসিডের পরিমাণ প্রয়োজন অপেক্ষা বেশিই হইয়া থাকে। ঐ উদ্‌বৃত্ত অ্যামিনো-অ্যাসিডের কি কোনো সদ্‌ব্যবহার হয় না। তাহাও হয়। শরীরের সর্বত্র রক্ত সঞ্চারিত হইয়া যতটা অ্যামিনো-অ্যাসিড খরচ হইবার তাহা হইয়া যায়, তাহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে উহা পুনরায় যকৃতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় আবার নূতন করিয়া উহার বিশ্লেষণ ঘটে। যকৃতের কোষগুলিতে এক প্রকার রাসায়নিক শক্তি আছে, উহার দ্বারা এই উদ্‌বৃত্ত অ্যামিনো-অ্যাসিড ভাঙিয়া উহার নাইট্রোজেন-অংশটুকু অ্যামোনিয়া হইয়া তৎপরে উহা ইউরিয়া নামক দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়, ও তাহা মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। উহার নাইট্রোজেনবিহীন অংশ যাহা বাকি থাকে তাহা কার্বোহাইড্রেটের মতোই ক্রিয়া করে, অর্থাৎ গ্লুকোজে পরিণত হইয়া শরীরের ইন্ধনের প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। অতএব প্রোটিন খাদ্য যে কেবলমাত্র গঠন কার্যেই লাগে তাহা নয়, ইহার দ্বারা কর্মশক্তিও সৃষ্টি হয়। প্রোটিন অল্প খাইলে তাহা হয় না, কারণ তখন গঠন-কার্যেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। এইজন্য দেখা যায় যে, অল্প প্রোটিন খাইলে মূত্রের মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষিত হয় না, কিন্তু অধিক খাইলেই মূত্রে ইউরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

কিন্তু প্রোটিন যদি আদৌ না খাওয়া যায় তাহা হইলে কী হয়। প্রোটিনের দ্বারা কার্বোহাইড্রেটের কাজ চলে, কিন্তু কার্বোহাইড্রেটের

দ্বারা কখনো প্রোটিনের কাজ চলিতে পারে না, কারণ উহার মধ্যে একটুও নাইট্রোজেন নাই। খাদ্য হইতে যদি একটুও প্রোটিন না পাওয়া যায়, শরীর তখন নিজের প্রোটিন ভাঙিয়া কাজ চালাইতে শুরু করে। অর্থাৎ তখন শরীরের অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় অঙ্গসমূহের নিজস্ব প্রোটিন ভাঙিয়া অ্যামিনো-অ্যাসিড জন্মিতে থাকে, এবং তাহা লইয়াই তখন শরীরের অধিকতর প্রয়োজনীয় অংশগুলি আপন ক্ষয় নিবারণ করিতে থাকে। এইরূপে প্রোটিনের অভাবে শরীর শেষ পর্যন্ত একে একে নিজের যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া নিজেকে রক্ষা করিয়া চলে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে উহার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নূতন নূতন প্রোটিন চাই, তদ্‌ব্যতীত উহার চলিবে না।

কার্বোহাইড্রেটের পরিণতি

কার্বোহাইড্রেটের মেটাবলিজম অন্য প্রকার। কার্বোহাইড্রেট যে কোনো প্রকারেই খাওয়া হউক, উহা অবশেষে একমাত্র গ্লুকোজে পরিণত হইয়া রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। সকল প্রকারের কার্বোহাইড্রেট খাদ্য গ্লুকোজে পরিণত হইয়া পূর্বোক্ত রূপে রক্তে মিশিয়া প্রথমে পোর্টাল শিরার মধ্য দিয়া যকৃতে প্রবেশ করে, তৎপরে উহা শরীরস্থ সমস্ত রক্তে সঞ্চারিত হয়। সেইজন্য কার্বোহাইড্রেট খাইবার কিছুক্ষণ পরে রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা যায় উহাতে গ্লুকোজের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু উহার দুই ঘণ্টাকাল পরে পুনরায় পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, তাহা আবার কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ রক্তের মধ্যে গ্লুকোজ আসিয়া উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ আমাদের যকৃত এবং মাংসপেশীসমূহ উহা রক্ত হইতে আহরণ করিয়া লয় এবং একরূপ

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা উহাকে গ্লাইকোজেন নামক দ্রব্যে পরিবর্তিত করিয়া আপন কোষগুলির মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই সঞ্চয়কার্য মাংসপেশী অপেক্ষা যকৃতেই সর্বাপেক্ষা বেশি হয়।

যকৃতের এই সঞ্চিত গ্লাইকোজেনের পরিমাণ এত অধিক থাকে যে, কিছুদিন পর্যন্ত অভুক্ত থাকিলেও তাহার দ্বারা শরীরের কাজ চলিয়া যায়; সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যও তাই। খাদ্যের গ্লুকোজ হইতে আগে যথা-সম্ভব গ্লাইকোজেন সঞ্চয় করিয়া লইয়া অতঃপর যকৃতের কোষগুলি ধীরে-সুস্থে তাহা ভাঙিয়া ভাঙিয়া পুনরায় অল্প অল্প গ্লুকোজ প্রস্তুত করিতে থাকে, এবং রক্তস্রোতের মধ্যে তাহা প্রেরণ করিয়া শরীরের সর্বত্র গ্লুকোজের একটি নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখিতে থাকে। শরীরের পক্ষে ইহা নিতান্তই প্রয়োজন, সর্বদাই তাহার ইন্ধন চাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যের গ্লুকোজ রক্ত হইতে যকৃতে গিয়া একবার হইবে গ্লাইকোজেন, এবং পুনরায় তাহা গ্লুকোজ হইয়া রক্তমধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকিবে এবং তখন শরীরের প্রত্যেক কোষে তাহা ব্যয়িত হইতে থাকিবে।

যদি কার্বোহাইড্রেট খাদ্য একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় অর্থাৎ প্রোটিন ব্যতীত কিছুই না খাইতে দেওয়া হয়, তবে পূর্বোক্ত প্রকারে যকৃত উহার অ্যামিনো-অ্যাসিড হইতেই গ্লুকোজ বানাইয়া লইবে। যদি তাহাও না দেওয়া যায়, তবে শরীরের নিজস্ব চর্বির সঞ্চয় ভাঙিয়াই সে কাজ চালাইবার চেষ্টা করিবে, কারণ যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ তাহাকে ইন্ধন জোগাইতেই হইবে।

যকৃত এই যে নিত্য গ্লুকোজেন সঞ্চয় করিয়া থাকে, ইহা তাহার নিজস্ব শক্তিতে নয়। আমাদের পেটের ভিতর পাকস্থলীর পশ্চাতে প্যাংক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় নামক একটি সুবৃহৎ গণ্ড আছে। আমরা

ইতিপূর্বে জানিয়াছি যে উহার সহিত অন্ত্রের যোগ আছে এবং উহা হইতে পাচকরস অন্ত্রে আসিয়া খাদ্য হজম করায়। কিন্তু তাহা ছাড়াও উহার একটি দ্বিতীয় প্রকার আভ্যন্তরিক রস আছে। এই আভ্যন্তরিক রসের নাম ইন্‌সুলিন। এই ইন্‌সুলিন সর্বদাই ক্ষরিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহাই যকৃতের মধ্যে ও মাংসপেশীসমূহের মধ্যে গিয়া গ্লুকোজকে গ্লাইক্লোজেনে পরিণত করিবার উপযোগী রাসায়নিক শক্তি দান করে। ইহার অভাবে যকৃত কোনোমতে গ্লাইকোজেন প্রস্তুত করিতে পারে না। সুতরাং কাহারও শরীর হইতে যদি প্যাংক্রিয়াস গণ্ডটি কাটিয়া বাদ দেওয়া যায় কিংবা যদি উহা নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, তখন দেখা যাইবে যে কার্বোহাইড্রেট খাদ্য যতই খাওয়া হউক, উহার গ্লুকোজ আর কোথাও সঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারিতেছে না, তাহা রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও কিছুক্ষণ পরেই মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যাইতেছে। অতএব গ্লুকোজের যে উদ্দেশ্য সময়মতো অল্প অল্প করিয়া সর্বশরীরের ইন্ধন জোগাইতে থাকা,—তাহা আর হইতেছে না। প্যাংক্রিয়াস গণ্ডে আভ্যন্তরিক রসের অভাব ঘটিলে এইরূপ একটি রোগ উপস্থিত হয়, উহারই নাম ডায়েবিটিস বা বহুমূত্র রোগ। উহাতে গ্লুকোজ সঞ্চিত থাকিতে না পারায় ক্রমাগতই তাহা মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যাইতে থাকে এবং যথেষ্ট খাদ্য খাওয়া সত্ত্বেও ইন্ধনের অভাবে শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত ও দুর্বল হইতে থাকে। এই ইন্‌সুলিন বা আভ্যন্তরিক রস আবার সুস্থ ব্যক্তির শরীরেও সকলের পক্ষে সমান নয়, কাহারও শরীরে ইহার পরিমাণ অল্প, কাহারও বেশি। যাহার শরীরে ইহার পরিমাণ কম সে আপন মাত্রার কিছু অধিক কার্বোহাইড্রেট খাইলেই তাহার মূত্রে গ্লুকোজ দেখা দিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে কার্বোহাইড্রেট খাদ্য কেবল হজম হইলেই নিষ্কৃতি নাই, তাহা আমাদের শেষ পর্যন্ত কাজে লাগিবে কিনা ইহা

সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে অগ্ন্যাশয় গণ্ডের উপর, একাকী যকৃতেরও তাহাতে কোনো হাত নাই।

আমরা ইতিপূর্বে কেবল এইটুকুই জানিয়াছিলাম যে যকৃত পিত্তরস ক্ষরণ করে এবং তাহা হজমের পক্ষে সাহায্য করে। কিন্তু যকৃতের মধ্যে যে আরো কত বহুমুখী রাসায়নিক শক্তি নিহিত আছে তাহা এখন জানা যাইতেছে। কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের গ্লুকোজ এবং প্রোটিন খাদ্যের অ্যামিনো-অ্যাসিড দুইই প্রথমে যকৃতের মধ্য দিয়া সর্বশরীরের রক্তে যাতায়াত করে এবং উহার কমবেশি হইলে নানাবিধ রাসায়নিক কৌশলে যকৃত তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দেয়। যদি কোনো বিষাক্ত বীজাণু পেটের ভিতর হইতে রক্তের মধ্যে যায় কিংবা কোনো খাদ্যের বিষ যদি রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সর্বশরীরে সঞ্চারিত হইবার পূর্বেই যকৃতের কোষগুলি তাহা যথাসাধ্য আটক রাখিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। আবার ভিতরের নানারূপ কোষ ও রক্তকণিকা ভাঙিয়া যে-সকল জৈব ক্লেদবস্তু রক্তে সঞ্চিত হয়, যকৃতই তাহা আহরণ করিয়া লইয়া পিত্তের সহিত অন্ত্রমধ্যে চালান করিয়া দেয়, যাহাতে তাহা মলের সহিত বাহিরে নির্গত হইয়া যায়। আমরা যকৃতকেই নানারূপ ব্যাধির জন্য দায়ী করিয়া থাকি, পেটের যাহা কিছু বিকৃতি ঘটে তাহাতেই বলি লিভারের দোষ হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক লিভারের নিজস্ব দোষ খুব অল্পই হয়। যাহা কিছু পেটের দোষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রায়ই যকৃতের নয়, উহার পিত্তনালী প্রভৃতির। পিত্তনালী কোনো কারণে ফুলিয়া উহার পথ বুজিয়া গেলে পিত্ত নির্গত হইতে পারে না, তখন উহা ফিরিয়া আসিয়া যকৃতে প্রদাহ উপস্থিত করে এবং রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া ন্যাবা রোগের সৃষ্টি করে ও সর্বশরীর হরিদ্রাভ করিয়া দেয়। যকৃত সহজে নষ্ট হয় না, যদি-না আমরা অত্যাচারের দ্বারা

উহাকে নষ্ট করি। অতিরিক্ত মদ্য পান করিলে তাহা হয়, তখন যকৃতের কোষগুলি নষ্ট হইয়া তাহার স্থানে অনাবশ্যক ছোবড়া জন্মিয়া যায়। এ ছাড়া যকৃতের সহজে কোনো নিজস্ব বিকৃতি ঘটে না।

ফ্যাটের পরিণতি

এখন চর্বি বা ফ্যাট মেটাবলিজ্‌মের কথা বলি। আমরা জানি যে শরীরের অনেক স্থানেই চর্বি থাকে। সর্বাপেক্ষা অধিক চর্বি থাকে চামড়ার নিচে। সেইজন্য যে জন্তুর গায়ে যত চর্বি, তাহার উপরকার চামড়ার আবরণ তত পুরু এবং থলথলে হয়। কিন্তু বাহিরের চামড়া ব্যতীত পেটের ভিতরে ও ঝিল্লীর আবরণের গায়ে গায়েও অনেক চর্বি থাকে, মাংসপেশীসমূহের মধ্যেও চর্বি থাকে, এবং কোনো কোনো জন্তুর যকৃতের মধ্যেও অনেক চর্বি দেখা যায়, যেমন কড্‌ জাতীয় মৎস্য। এই চর্বি আসে কোথা হইতে। অবশ্যই ইহা অতিরিক্ত খাদ্য হইতেই আসে, কারণ, স্থূল পর্যবেক্ষণের দ্বারা দেখা যায় যে, কম খাইলেই আমরা রোগা হইয়া যাই, বেশি খাইলেই আমাদের গায়ে চর্বি লাগে। অর্থাৎ শরীরে ব্যয়ের জন্য যতটা খাদ্যের প্রয়োজন তাহার অধিক খাইলেই চর্বি জমিতে থাকে, আবার প্রয়োজন হিসাবে খাদ্যের মাত্রায় অকুলান ঘটিলে সেই চর্বি কমিতে থাকে। আমরা ইতিপূর্বে গ্লাইকোজেন সঞ্চয়ের কথাও বলিয়াছি। ঐ সঞ্চয় দৈনন্দিন খরচের জন্য, সুতরাং উহার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। আর চর্বির সঞ্চয় কেবল ভবিষ্যৎ দুঃসময়ের জন্য, সুতরাং উহার কোনো সীমা নাই, যত ইচ্ছা সঞ্চয় হইয়া থাকিতে পারে। প্রথমটিতে প্রত্যহই জমা এবং প্রত্যহই খরচ চলিতে থাকিবে, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে প্রত্যহ জমা হইতে থাকিলেও প্রত্যহ খরচ হইবে না, কেবল অসময়ের মোটা খরচের জন্য উহা তোলা রহিল। শরীরে চর্বি জমিয়া

থাকিবার ইহাই আসল প্রয়োজনীয়তা। কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের অভাব ঘটিলে উহার পরিবর্তে চর্বিই তখন ইন্ধনের ন্যায় জলিয়া কর্মশক্তি এবং তাপ উৎপন্ন করিতে থাকে।

আমরা দেখিতে পাই যে পরিশ্রম যতই অধিক হয় ততই মেটাবলিজমের প্রক্রিয়া বাড়িয়া যায়, উহা যতই অল্প হয় ততই কমিয়া যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্রাম অবস্থায় থাকিয়া যদি কিছুই পরিশ্রম না করা যায়, তথাপি শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়াসকল চালাইবার জন্য এই প্রক্রিয়া কিছু পরিমাণে চলিতে থাকে। এই লঘিষ্ঠ পরিমাণ প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয় বেসাল্ মেটাবলিজ্‌ম্। দেখা গিয়াছে যে, ইহার পরিমাণ সকলের পক্ষে সমান নাই, কাহারো বেশি কাহারো কম। অতএব ইহার সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ এবং নির্ধারণ করে কে। এই কথার উত্তর দিতে হইলে অপর একটি গণ্ডের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। উহার নাম থাইরয়েড, উহা কণ্ঠদেশের সম্মুখে অবস্থিত। উহার একরূপ আভ্যন্তরিক রস আছে, তাহাই রক্তমধ্যে চালিত হইয়া মেটাবলিজ্‌মের প্রক্রিয়াকে উত্তেজিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। ইহারই প্রেরণায় কেহ বা অতিরিক্ত পরিশ্রমী এবং অতিরিক্ত চঞ্চল, কেহ বা শ্লথস্বভাব ও মন্থরগতি। কাহারো বা অল্প ভোজনে পর্যাপ্তি ঘটে, কাহারো বা অধিক ভোজনে যথেষ্ট হয় না। থাইরয়েড গণ্ডটি আকারে অতি ক্ষুদ্র, এবং উহা হজমের যন্ত্রগুলি ও রক্ত-চলাচলের যন্ত্রগুলি হইতে অনেক দূরে কণ্ঠদেশে অবস্থিত। তথাপি উহা হইতে যে সামান্য আভ্যন্তরিক রসটুকু ক্ষরিত হয়, শরীরের মেটাবলিজম্‌সমূহ চালনার পক্ষে তাহার এমন প্রতাপ।

প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট

এখন আমরা বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যের গুণাগুণ লইয়া কিছু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। খাদ্য সম্বন্ধে মানুষের রুচি এবং বিচারও যেমন বিভিন্ন, খাদ্য প্রস্তুতের প্রণালীও তেমনি বহুবিধ। বস্তুত দেশভেদে এবং সমাজভেদে মানুষের খাদ্য সম্বন্ধে এত রকমের বৈচিত্র্য দেখা যায় যে, তাহার কোনো ইয়ত্তা নাই। আমরা অনেকে হয়তো দৈনিক দুইবার খাইলেই যথেষ্ট হইল বলিয়া মনে করি, কিন্তু বিলাতের লোকেরা দৈনিক চার পাঁচবার করিয়া খায়। তাহাদের সকালে ব্রেকফাস্ট, দুপুরে লাঞ্চ, বৈকালে চা, সন্ধ্যায় ডিনার ও অধিক রাত্রে সাপার, প্রত্যেকবারেই রকমারি খাদ্য। আবার ফ্রান্স জার্মানি ও আমেরিকার অধিবাসীরা এতবার খায় না। কেবল ইহাই নয়, ভোজ্যবস্তু সম্বন্ধেও বিভিন্নদেশে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। সভ্য জগতের লোকেরা সাধারণত মিশ্র খাদ্য খাইয়া থাকে। তাহারা মাছ-মাংসও খায়, কিছু ভাত-রুটিও খায়, দুধও খায় এবং ফলমূলাদিও খায়। কিন্তু এমন দেশও আছে, যেখানে মানুষ প্রায় এক রকমের খাদ্য খাইয়াই জীবনধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, মেরুপ্রদেশের এসকিমোদের কথা। ইহাদের দেশে বরফের মধ্যে কোনো শস্যাদি জন্মায় না, ইহারা কেবলমাত্র শীলের মাংস ও চর্বি খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে, তদ্‌ব্যতীত অধিকাংশ সময়েই ইহাদের দ্বিতীয় আর খাদ্য নাই। আবার অন্য দিক দিয়া উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদেরই দেশে নানাজাতীয় গরিবদের কথা। তাহারা সামান্য শাক-ভাত এবং মুড়ি খাইয়াই হয়তো সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেয়। পার্বত্য দেশের অনেক গরিবদের তাহাও জুটে না, ভুট্টা-জনার ব্যতীত

অন্য কোনো শস্য তথায় পাওয়া যায় না, উহাই পিষিয়া রুটি প্রস্তত করিয়া বন্য শাকসবজির সহিত খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

কিন্তু খাদ্যের প্রকৃত আদর্শ এরূপ নয়। যে বস্তুগুলি যথাসম্ভব সহজে শরীরকে যতটা সম্ভব সুস্থ এবং দীর্ঘায়ু রাখিয়া উহার যথাসম্ভব সর্বাঙ্গীণ পরিণতি এবং স্ফূর্তি ঘটিবার সুবিধা করিয়া দেয় তাহাই সম্মিলিত ভাবে খাদ্যপদবাচ্য হইবে। আদর্শানুযায়ী ফল পাইতে হইলে আমাদের সকল জাতীয় খাদ্যবস্তুই যথাযথ ভাবে মিশাইয়া খাইতে হয়। খ্যাতনামা জার্মান খাদ্যতত্ত্ববিদ্ ভয়েট্ বলেন, আদর্শ খাদ্য বলিতে খাদ্যবস্তুসমূহের এমন একটি সংমিশ্রণ বুঝায় যাহা খাইতে সুস্বাদু, যাহা সর্বতোভাবে শরীরের সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে পারে, এবং যাহাতে এমনই মাত্রায় খাদ্যবস্তুসমূহ সংযোজিত যে, তদ্দ্বারা শরীরকে কোনোরূপ কষ্ট বা অসুবিধায় না পড়িতে হয়। বলা বাহুল্য, এই সংজ্ঞা অনুসারে খাদ্যতালিকা নির্ধারণ করিতে হইলে সকল জাতীয় খাদ্যের স্বতন্ত্র গুণাগুণ আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। যদিও সকল প্রকার খাদ্যের সংমিশ্রণ প্রয়োজন, তথাপি দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে সকলের পক্ষে সকল রকম খাদ্যবস্তু খাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং একের অভাব যাহাতে অন্যের দ্বারা মিটিতে পারে তাহাও জানিবার জন্য খাদ্যসমূহের গুণাগুণ বুঝিয়া রাখার আবশ্যক আছে।

প্রোটিন

প্রোটিন জাতীয় খাদ্য আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। প্রোটিন ব্যতীত মানুষের জীবনরক্ষা করা অধিক দিন সম্ভব হয় না। প্রোটিন খাদ্য নানা প্রকারের আছে, তন্মধ্যে প্রথমেই ধরা যাক, মাংসাদি বর্গের কথা। সম্পূর্ণ এবং আদর্শ প্রোটিন বলিতে প্রথমত জীবমাংসের কথাই

বলিতে হয়। আমাদের শরীরের মাংসাদির সহিত অন্যান্য জীবমাংস অনেকটা সমগুণসম্পন্ন, সুতরাং সহজেই উহা আমাদের শরীরের মধ্যে মিশিয়া গিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করিতে পারে। সহজপাচ্য মাংসের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগই জল, শতকরা ২০ ভাগ পেশীবস্তু এবং উহাই যথার্থ প্রোটিন, আর বাকি চর্বি। অধিকন্তু ইহার মধ্যে কিছু কিছু ভিটামিন আছে, লৌহ প্রভৃতি ধাতব লবণাদিও আছে, কিন্তু কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যবস্তু আদৌ নাই। প্রোটিনের ভাগ সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে থাকে পাখির মাংসে। মুরগি এবং অন্যান্য পাখির মাংস সর্বাপেক্ষা সহজপাচ্য, কারণ উহাতে চর্বির ভাগ খুব কম, প্রোটিনের ভাগই বেশি। চতুষ্পদ জন্তুর মাংসে উহা অপেক্ষা কম প্রোটিন থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বহুপ্রকার চতুষ্পদ জন্তুর মাংসের মধ্যে ছাগমাংসেই প্রোটিনের পরিমাণ তুলনায় কিছু অধিক। ভেড়ার মাংসে উহা কম, কারণ তাহাতে চর্বির পরিমাণ বেশি। গো-মাংস খাদ্য হিসাবে নির্দোষ, এবং সুলভ, কিন্তু অনেকের উহা খাইতে সংস্কারে বাধে। শূকরের মাংস উহা হইতে দুষ্পাচ্য এবং উহা খাইতেও অনেকের সংস্কারে বাধে। মাংসমাত্রই অতি সহজে হজম হয়, যদি উহা অতিরিক্ত ঘি মসলার দ্বারা গুরুপাক করিয়া তোলা না হয়। সর্বাপেক্ষা সহজে হজম হইতে পারে কাঁচা মাংস, কিন্তু উহা না রাঁধিয়া খাইতে অনেকেই অভ্যস্ত নয়।

মাংস ব্যতীত আরো সম্পূর্ণ ধরনের প্রোটিন খাদ্য আছে, যেমন ডিম। জীবদেহ গঠনের উপযুক্ত সমস্ত উপাদানই ইহাতে আছে। একটি ডিমের মধ্যে প্রায় সিকি আউন্স প্রোটিন থাকে, সুতরাং ষোলোটি ডিম খাইলেই একজন মানুষের একদিনের পুরা খোরাক হইয়া যাইতে পারে। দুধও যেমন সম্পূর্ণ-খাদ্য, ডিমও তেমনি সম্পূর্ণ-খাদ্য, কারণ ইহার মধ্যে খাদ্যের সকল প্রকার মুখ্যবস্তুই কিছু কিছু পরিমাণে আছে। কেবল

ইহাতে কার্বোহাইড্রেটের অভাব। সুতরাং ডিমের সহিত কিছু রুটি বা ভাত খাইলেই উহা আমাদের প্রয়োজনীয় খোরাকের সমস্ত অভাব মিটাইতে পারে। ডিমের সাদা অংশের সমস্তটাই অ্যালবুমেন, উহা একেবারে খাঁটি প্রোটিন। ডিমের হরিদ্রা অংশেও প্রোটিন আছে, কিছু চর্বি আছে, লেসিথিন প্রভৃতি ফসফরাসযুক্ত পদার্থ আছে, এবং ভিটামিন "সি" ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকারের ভিটামিন আছে। ডিমের মধ্যে মুরগির ডিমই উত্তম। হাঁসের ডিমে প্রোটিন প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই আছে, কিন্তু উহাতে সকল প্রকার ভিটামিনের অভাব। ডিম কাঁচা খাওয়াই উপকারী, কারণ উহা খাইবামাত্র অবিলম্বে পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে প্রবেশ করিয়া অতি সহজে এবং পাকস্থলীর বিনা প্রয়াসেই হজম হইয়া যায়। এইজন্য যাহার পাকস্থলীতে কোনো প্রকার ক্ষত হইয়াছে, তাহার জন্য চিকিৎসকেরা কাঁচা ডিম খাইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। খালিপেটে কাঁচা ডিম খাইলে উহা অবিলম্বে অন্ত্রে গিয়া পরিপাক হইয়া যাইবে। সিদ্ধ ডিম হজম হইতে কিছু বিলম্ব হয়, কারণ, সিদ্ধ করিলেই উহার সাদা অংশ কঠিন হইয়া যায়। সিদ্ধ ডিমই যাঁহাদের প্রিয় অথচ হজম সম্বন্ধে যাঁহাদের সন্দেহ আছে, তাঁহারা সিদ্ধ ডিমের সাদা অংশটি ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ভিতরকার হরিদ্রা অংশটুকু অনায়াসে খাইতে পারেন।

মাছও সম্পূর্ণ ধরনের প্রোটিন খাদ্য। ইহাতে প্রোটিনের ভাগ মাংসাদি অপেক্ষা নিতান্ত কম নয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন মাছে প্রোটিনের মাত্রা বিভিন্ন প্রকার। সর্বাপেক্ষা অধিক প্রোটিন থাকে সিঙ্গি মাছে, তাহার পর কই, তাহার পর মাগুর, তাহার পর অন্যান্য মাছ। কিন্তু ঐগুলিতে প্রোটিন থাকিলেও চর্বি নাই। সুতরাং রোগীর পথ্য হিসাবেই ঐগুলি ব্যবহৃত হয়। তপসে, ট্যাংরা, পারশে প্রভৃতি মাছে প্রোটিনের

মাত্রা কিছু কম। মৌরলা, বেলে, পুঁটি, প্রভৃতি কুচো মাছে অল্পই প্রোটিন থাকে। চিংড়ি মাছ ও কাঁকড়ায় যথেষ্ট প্রোটিন আছে বটে, কিন্তু উহা অনেকেরই পক্ষে হজম করা দুঃসাধ্য। বড়ো মাছ এবং ছোটো মাছে প্রোটিনের কোনো পার্থক্য নাই, কিন্তু বড়ো মাছ হজম করা কঠিন এইজন্য যে, উহাতে অধিক পরিমাণে চর্বি থাকে। চাঁই এবং ইলিশ প্রভৃতি চর্বিযুক্ত মাছে ভিটামিন "এ" আছে বটে কিন্তু উহা অধিক পরিমাণে খাইলে হজম করা কঠিন। ইলিশ মাছ, ভেট্‌কি, কাতলা ও মৃগেল মাছ সর্বাপেক্ষা অধিক চর্বিযুক্ত এবং এইগুলি খাইতেও সুস্বাদু, কিন্তু অধিক মাত্রায় খাইলেই হজমের বিঘ্ন ঘটায়।

প্রোটিন-খাদ্য হিসাবে অনেকেই মাছ খাইতে পারে, কারণ অনেকের মাংস খাইতে যতটা আপত্তি থাকিতে পারে মাছ খাইতে ততটা থাকে না। কিন্তু যাহারা আদৌ আমিষ খায় না তাহাদের পক্ষে দুধ এবং দধি, ও ছানা প্রভৃতি দুগ্ধজ খাদ্য ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অন্যান্য কয়েক প্রকার নিরামিষ খাদ্যের মধ্যেও কিছু কিছু প্রোটিন আছে, তাহা অতঃপর বলা হইতেছে।

যাঁহারা কোনো আমিষ খাইবেন না, তাঁহাদের জন্য নিরামিষের মধ্যেই প্রোটিনের সন্ধান দিতে হইবে। তবে বলা বাহুল্য, নিরামিষের প্রোটিন অসম্পূর্ণ প্রোটিন, অর্থাৎ শরীরের প্রোটিনের অভাব যেমন কোনো একটিমাত্র আমিষ-প্রোটিনের দ্বারা পূরণ হয়, তেমনি ভাবে কোনো একটিমাত্র নিরামিষ-প্রোটিনের দ্বারা পূরণ হয় না। কিন্তু একের মধ্যে যে রাসায়নিক অসম্পূর্ণতা আছে, অন্যের দ্বারা তাহা পূরণ হইতে পারে। অতএব নানাপ্রকার নিরামিষ-প্রোটিন একত্রে মিশাইয়া খাইলে উহার সমষ্টিগত ক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ প্রোটিনের কাজ কতক পাওয়া যায়। তদুপরি উহার সহিত যদি দুধ খাওয়া যায়, তবে তো

কথাই নাই। নিরামিষাশীরা এইরূপেই নানাপ্রকার খাদ্যের সমাবেশের দ্বারা প্রোটিনের প্রয়োজন সিদ্ধ করে।

আমিষ হইতে নিরামিষের পার্থক্য এই যে, নিরামিষ বা উদ্ভিজ্জ খাদ্যমাত্রেই জলের ভাগ বেশি আছে, শর্করা ও কার্বোহাইড্রেটের ভাগ অত্যন্ত বেশি, এবং প্রোটিনের ভাগ কম। কয়েক প্রকার বিশিষ্ট নিরামিষ খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন থাকে বটে তথাপি উহা অসম্পূর্ণ প্রোটিন। অর্থাৎ মাংসাদি সম্পূর্ণ ধরনের প্রোটিনে যত প্রকারের অ্যামিনো-অ্যাসিড থাকে, নিরামিষ প্রোটিনে উহার সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক কম। ঐ সকল অ্যামিনো-অ্যাসিড হইতেই শরীরের আপন প্রোটিন নির্মিত হয়, সুতরাং সম্পূর্ণ ধরনের প্রোটিন অল্প খাইলেই যে কাজ হয়, অসম্পূর্ণ ধরনের প্রোটিন অনেক খাইলেও তেমন হয় না। অপরপক্ষে নিরামিষ শস্যাদির মধ্যে প্রোটিন এমনই দুর্ভেদ্য আবরণের মধ্যে থাকে যে রীতিমতো পিষিয়া না খাইলে উহার আবরণও ভাঙে না, উহা হজমও হয় না।

যাহাকে আমরা ডাল বলি, তাহাও এক জাতীয় প্রোটিনযুক্ত খাদ্য। ডাল আমাদের দেশে সকলের পক্ষেই ব্যবহার্য এবং উহা যে ভাত-রুটির সহিত খাইতে আমরা এত অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহা সম্ভবত প্রয়োজনের দিক হইতেই। ডালের প্রোটিনের নাম লেগুমেন। ডালের শস্য নানা প্রকারের আছে, যেমন ছোলা, মটর, বরবটি, কলাইশুঁটি ইত্যাদি। এই শস্য পাকিলে বা শুকাইলে আমরা তাহাকে ভাঙিয়া ডাল রাঁধিয়া খাই, অথবা গুঁড়া করিয়া ছাতু খাই এবং উহার দ্বারা পুরি ও পাঁপর বানাই, অথবা বাটিয়া বড়া-বড়ি, ধোঁকা প্রভৃতি প্রস্তুত করি। মসুর, মুগ এবং ছোলার ডালে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রোটিন। মুগের ডাল হজম করা সহজ। অড়হর ডাল হজম করা

কিছু কঠিন, উহাতে গন্ধক থাকার দরুন পেটে কাহারো কাহারো বায়ু জন্মাইতে পারে। ডালবর্গের মধ্যে বিশেষ করিয়া একটি উদ্ভিজ্জ প্রোটিনসম্পন্ন উৎকৃষ্ট বস্তুর নাম উল্লেখ করা যায় উহা সোয়াবিন। ইহার প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ, মাংসাদির মধ্যেও এতটা পরিমাণ প্রোটিন নাই। পূর্বে চীন জাপানে ইহার চাষ হইত এবং খাদ্যে ব্যবহার হইত কিন্তু ইহার প্রোটিন সম্পদের কথা জানিতে পারায় বর্তমানে সর্বত্রই ইহার সমাদর হইতেছে এবং ইউরোপে যুদ্ধরত সৈনিকদিগকেও ইহা খাওয়ানো হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এখনও ইহার তেমন প্রচলন হয় নাই। ইহার দ্বারা নিরামিষাশীদের প্রোটিনের অভাব অনায়াসে পূরণ হইতে পারে।

প্রোটিন আরো আছে বাদাম, পেস্তা, আখরোট প্রভৃতি কঠিন আবরণযুক্ত কয়েকটি শুষ্ক ফলে। এইগুলি ভাঙিয়া খাইলে তন্মধ্যে প্রোটিন পাওয়া যায়। বিলাতে আজকাল যাঁহারা নিরামিষাশী হইতেছেন, তাঁহারা বাদাম পেস্তা প্রভৃতি চূর্ণ করিয়া উহা হইতে নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া প্রোটিনের অভাব পূরণ করিতেছেন। আমাদের দেশের পালোয়ানরাও এই সকল ফল বাটিয়া সরবতের সহিত খায়। এই জাতীয় শুষ্ক ফলের মধ্যে তুলনায় চীনা বাদামের প্রোটিনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। উহা দামেও কাগজি বাদাম বা পেস্তা প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক সস্তা। উহার মধ্যে অধিকন্তু কিছু তেলও আছে, কার্বোহাইড্রেটও আছে এবং ভিটামিন "বি" আছে। অতএব, যাঁহারা হজম করিতে পারিবেন, তাঁহাদের পক্ষে সকল দিক দিয়া চীনাবাদাম অতি উত্তম খাদ্য। উপরে কঠিন আবরণ থাকে বলিয়া ইহাতে কোনোরূপ বীজাণু সংস্পর্শ হইবারও আশঙ্কা নাই।

আমরা প্রোটিন খাদ্য অত্যন্ত কম পরিমাণে খাইয়া থাকি। ইহা

উচিত নয়। রুচি এবং রীতিকে যথাসাধ্য সংস্কার করিয়া নানা উপায়ে আমাদের খাদ্যতালিকায় প্রোটিনের মাত্রা আরো বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। ম্যাক্‌কে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে প্রোটিন কম খাওয়া হয় বলিয়াই বাঙালির আকার খর্ব, বাঙালির ওজন কম, এবং খাটিবার শক্তি কম। ম্যাক্‌কের মতে প্রোটিনের অভাবে রক্তে যথেষ্ট নাইট্রোজেন থাকে না, সেইজন্য বাঙালির কিড্‌নি শীঘ্র খারাপ হইয়া যায়। অধিকন্তু এই খাদ্যের অভাবেই বাঙালি যক্ষ্মারোগে ভোগে। মাংসাশী জীবদের মধ্যে যক্ষ্মারোগ হয় না। আরো দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর উন্নত এবং শক্তিশালী জাতিমাত্রেই মাংসাশী, বিজিত মাত্রেই নিরামিষ-প্রিয়। একথা প্রণিধানযোগ্য।

কার্বোহাইড্রেট

এইবার কার্বোহাইড্রেট বর্গের কথা। কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন আমাদের নিত্যই হইতেছে। যেমন পরিশ্রম করিব তদনুসারে কার্বোহাইড্রেটের খোরাক আমাদিগকে খাইতেই হইবে, নতুবা আমরা আর কর্মক্ষম থাকিব না। কার্বোহাইড্রেট খাদ্য বলিতে আমরা প্রধানত ধান গম প্রভৃতি শস্যাদির কথাই বলিতেছি। শস্যাদির মধ্যে যে প্রোটিন বস্তু একেবারেই নাই, তাহা নয়। কিন্তু কার্বোহাইড্রেটই অধিক মাত্রায় থাকাতে ঐগুলি কার্বোহাইড্রেট পদবাচ্য।

কার্বোহাইড্রেট কাহাকে বলে। যাহাতে কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্রে রাসায়নিক সংমিশ্রণে আছে, তাহাই কার্বোহাইড্রেট। দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন মিশিয়া হয় জল। তাহার সহিত কার্বন বিশিষ্ট প্রকারে মিশিলেই হয় কার্বোহাইড্রেট। এই কার্বন বায়ুতে থাকে, আমরা নিশ্বাস-বায়ুর সহিত উহা পরিত্যাগ করি।

উদ্ভিদেরা অতি নিপুণ রাসায়নিক। তাহারা মাটি হইতে টানিয়া লয় জল আর বায়ু হইতে সেই কার্বন। এই দুই উপাদান লইয়া বিচিত্র রাসায়নিক কৌশলে উহারা যে শস্য উৎপন্ন করে, তাহাই কার্বোহাইড্রেট, তাহাই আমাদের খাদ্য।

তবে কার্বোহাইড্রেট বর্গ বলিতে অনেক জিনিস বুঝায়। মোটের উপর এইগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমত, স্টার্চ বা শ্বেতসার,—ইহাই শস্যাদি এবং আলু প্রভৃতি কন্দ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে থাকে। রন্ধিত স্টার্চ মুখের লালার দ্বারা সহজেই হজম হয়, কিন্তু অরন্ধিত স্টার্চ লালার দ্বারা হজম হয় না, উহা অন্ত্রে গিয়া প্রবেশ করিলে, তখন অগ্ন্যাশয় রসের দ্বারা হজম হয়। দ্বিতীয়ত, ডেক্‌স্ট্রীন—অর্থাৎ কতকটা হজমীকৃত দ্রবনীয় স্টার্চ। ইহা কিসমিস, খেজুর প্রভৃতি শুষ্ক ফলে, সেঁকা রুটির পোড়া পোড়া ছালে এবং কেক, বিস্কুট ও ভাজা মুড়ি বা খই প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, শর্করা,—সকল প্রকার মিষ্ট ফলে ও গুড় চিনি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্যে ইহা আছে। চতুর্থত, সেলুলোজ,—ইহা থাকে শস্যের ভুষিতে, ফলের এবং আনাজের খোসাতে ও বীজে। ইহা আমরা হজম করিতে পারি না, সুতরাং খাদ্য নয় বলিয়া ইহা আমরা ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিই।

কার্বোহাইড্রেট খাদ্য প্রধানত দুই প্রকারই আমরা সচরাচর খাই,—শ্বেতসার জাতীয় এবং শর্করা জাতীয়। ভারতের সর্বপ্রধান শ্বেতসার খাদ্য ভাত। ভারতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক কেবল ভাত খাইয়া জীবনধারণ করে। কিন্তু আমরা যেমনভাবে ভাতের ফেন ফেলিয়া দিয়া থাকি উহা অনুচিত। ভাতের ফেন ফেলিয়া দিলে ফেনের সহিত অনেকটা ভিটামিন ও স্টার্চ চলিয়া যায়। ভাত অল্প জলে ফুটাইয়া এমন কৌশলে রাঁধিতে শেখা উচিত, যাহাতে আর ফেন গালিবার প্রয়োজন

না হয়, তাহা হইলে অল্প পরিমাণ ভাতেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে এবং খরচও কমিয়া যায়।

ভারতের সকল প্রদেশের লোকই ভাত খায় না। উত্তর ভারত ও বিহারে গরিব লোকেরা অনেকে ভুট্টা, জই এবং ছোলার ছাতু খাইয়াই জীবনধারণ করে। বোম্বাই ও মাদ্রাজ অঞ্চলের লোকেরা সাধারণত জওয়ার ও বাজ্‌রা খাইয়া থাকে। মহীশূর অঞ্চলের লোকে রাগি নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যের দানা ব্যবহার করে, উহার খাদ্যগুণ অনেকটা আটার মতো। বলা বাহুল্য, এর সবগুলিই শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য এবং খাদ্যগুণ প্রায় সবগুলিরই সমান, তবে ইহার মধ্যে চালেরই অধিক আভিজাত্য। উহার মধ্যে আবার মোটা চাল অপেক্ষা মিহি চালের কদর বেশি, যদিও উভয়ের মধ্যে গুণের কিছু পার্থক্য নাই। মাজা চাল ও কলে ছাঁটা বালাম চাল খাওয়া দোষের, কারণ চালের কুঁড়ায় ভিটামিন থাকে, কুঁড়া সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া চালকে পালিশ করিলে উহা ভিটামিনবিহীন হইয়া যায়। চালের মধ্যে মিহি চাল অপেক্ষা মোটাই ভালো এবং মাজা চাল অপেক্ষা লাল কুঁড়াসমেত চালই ভালো। আরো এক কথা, আতপ চাল অপেক্ষা সিদ্ধ চালই খাদ্যগুণে অধিক উপকারী। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ধানকে সিদ্ধ করিলে উহার চালের উপরকার খাদ্যসম্পদগুলি চালের ভিতরদিকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং সেই চাল কলে ছাঁটা হইলেও তাহার সারবস্তুগুলি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না। কিন্তু আতপ চাল যদি কলে ছাঁটা হয় তবে আর তাহার সার পদার্থ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং আতপ চাল খাইতে হইলে তাহা কেবল ঢেঁকিতে ছাঁটিয়াই খাওয়া উচিত, কিন্তু ঢেঁকি-ছাঁটা সিদ্ধ চালই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

ভাত রাঁধিবার পূর্বে আমরা চালগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য জলে

উত্তমরূপে ধুইয়া লই। তাহাও অন্যায় করা হয়। চালের বহির্গাত্রে ফস্‌ফরাস এবং অন্যান্য ধাতব লবণাদি থাকে, এবং কিছু ভিটামিনও থাকে। জল দিয়া উত্তমরূপে ধুইবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐগুলি অনেক পরিমাণে জলের সহিত মিশিয়া চলিয়া যায়। রাঁধিবার কালে ঐগুলি যত নির্গত হয়, জলে ধুইলে তাহা অপেক্ষা আরো অধিক নির্গত হয়। অতএব চাল যত কম ধোওয়া হয় ততই তাহা উপকারী। চাল পরিষ্কার থাকিলে তাহা ধুইবার কোনোই প্রয়োজন নাই।

যব, গম প্রভৃতি রবিশস্যও শ্বেত্সার খাদ্য, তবে উহাতে শ্বেতসারের ভাগ কিছু কম; প্রোটিনের অংশ কিছু বেশি। যব চূর্ণ করিয়া সাধারণত আমরা বার্লিরূপে ব্যবহার করি। গম চূর্ণ করিয়া আমরা আটা, ময়দা ও সুজি প্রস্তুত করি। গমচূর্ণের সর্বাপেক্ষা মিহি অংশের নাম ময়দা, উহাতে গমের ভূষি অংশের প্রায় কিছুই থাকে না, সুতরাং উহাতে ভিটামিন ও প্রোটিন অত্যন্ত কম। আটা অর্থে ভূষিসমেত সমগ্র গমচূর্ণ, সুতরাং উহাতে ভিটামিন ও প্রোটিন কিছু থাকে। সুজি অর্থে মিহি ময়দা বাদ দিয়া আরও মোটা দানার গমচূর্ণ, সুতরাং উহাতে গ্লুটেনও থাকে এবং ভিটামিনও থাকে, কেবল শ্বেতসারের ভাগ কম থাকে। আটা ও ময়দা হইতে আমরা রুটি, লুচি, এবং পরোটা প্রস্তুত করি। হজম করা অভ্যাস থাকিলে খাদ্য হিসাবে ভাত অপেক্ষা রুটি ও লুচি উত্তম, এবং তাহা সাদা ময়দা অপেক্ষা লাল আটা হইতে প্রস্তুত করা উত্তম। আমাদের মধ্যে অল্প পরিশ্রমী মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের পক্ষে দুই বেলা ভাত খাওয়ার পরিবর্তে এক বেলা ভাত এবং এক বেলা রুটি খাওয়া অভ্যাস করা উচিত। দুই বেলা ভাত খাইলে তাহা একঘেয়ে খাদ্য হইয়া পড়ে এবং ভাতের পারমাণ অধিক হইলে হজমের বিঘ্ন ঘটিয়া ডিসপেপসিয়া প্রভৃতি স্থায়ী পেটের রোগের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে ভাত

বন্ধ করিয়া রুটি খাইতে দিলে ঐ সকল রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। তবে রুটি চাপাটি প্রভৃতি পশ্চিমদেশের লোকে যেমন প্রস্তুত করিতে জানে, বাংলাদেশের লোকে তাহা জানে না। উহারা যেমন উত্তমরূপে আটা মাখিয়া অনেকক্ষণ যাবৎ রুটিকে সেঁকিতে এবং পোড়াইতে থাকে, আমাদেরও তাহাই শিক্ষা করা উচিত। তাহার কারণ, আটার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানার গায়ে দুর্ভেদ্য সেলুলোজের খোসা লাগিয়া থাকে, উত্তমরূপে সেঁকিলে ও পোড়াইলে উহা ফাটিয়া যায়, তখন উহার ভিতরকার স্টার্চ বাহির হইয়া পড়ে এবং সহজে উহা হজম হয়।

এইবার শর্করাজাতীয় অন্যান্য কার্বোহাইড্রেটের কথা। শর্করা মাত্রই পরিপূর্ণ কার্বোহাইড্রেট। শর্করা অনেক প্রকার। প্রথমত, শুক্রোজ বা ইক্ষু-শর্করা ; ইহা গুড়ে এবং চিনিতে থাকে। দ্বিতীয়ত, লেভুলোজ বা ফলের শর্করা ; ইহা আম কাঁঠাল প্রভৃতিতে থাকে। তৃতীয়ত, গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষা-শর্করা। চতুর্থত, ল্যাক্‌টোজ বা দুগ্ধ-শর্করা। পঞ্চমত, মল্‌টোজ বা শস্য-শর্করা। ষষ্ঠত, ইনভার্টোজ বা ইনভার্ট শুগার, যাহা মধুতে আছে, ইহা ফলের শর্করা ও ইক্ষু-শর্করার সংমিশ্রণ। বলা বাহুল্য, কেবল উৎপত্তিস্থান অনুসারেই শর্করাগুলির এরূপ বিভাগ করা হয় নাই, প্রত্যেকটির মধ্যে বিশিষ্ট রাসায়নিক পার্থক্যও আছে। তবে যে শর্করাই হউক, পেটে গিয়া তাহা অবশেষে একই প্রকার গ্লুকোজে পরিণত হয়।

শর্করার অনেক গুণ। কার্বোহাইড্রেটের গুণ ছাড়াও ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা জিহ্বার পরিতৃপ্তি করে, ক্লান্তি দূর করিয়া মাংসপেশীকে ও হৃৎপিণ্ডকে সবল করে, শরীরে মেদ সঞ্চয় করে, এবং জ্বরের দাহ নিবারণ করে। তথাপি অধিক পরিমাণে শর্করা খাইতে নাই, অধিক খাইলেই শরীর অতিরিক্ত স্থূল হয়, নতুবা ডায়েবেটিস রোগ জন্মায়।

অধিক শর্করা খাইলে পেটে গিয়া গাঁজিয়া উঠিয়া মদ্যের ন্যায় পদার্থ প্রস্তুত করে এবং পেটের ভিতর তাহা নানারূপ অগুণ উপস্থিত করে। যাঁহারা চায়ের সহিত অধিক চিনি বা দুধের সহিত অধিক গুড় খান, কিংবা মিষ্টান্ন খাইতে বসিয়া অনেকগুলি খাইয়া থাকেন, তাহারা অত্যন্ত ভুল করেন। আমরা বাঙালিমাত্রই অত্যধিক মিষ্টপ্রিয়। সেইজন্য দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে অনেকে ডায়েবিটিস অথবা ডিসপেপসিয়া রোগে ভুগিয়া থাকে।

ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় খাদ্য

জান্তব খাদ্যমধ্যস্থ চর্বি ও ঘি, এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্যমধ্যস্থ তেল এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহাও কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন লইয়া বিভিন্ন প্রকারের সংমিশ্রণের দ্বারা গঠিত। কিন্তু উপাদান এক হইলেও এই বিভাগের খাদ্য স্বতন্ত্র জাতীয়, এবং ইহা হজম করিবার প্রণালীও অন্যান্য জাতীয় খাদ্য হইতে বিভিন্ন। ভারতবর্ষে আমরা সাধারণত ভৈঁষা ও গাওয়া ঘি হইতে ও নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ তেল হইতে এই খাদ্যের অভাব পূরণ করি। মাছ মাংসাদির সহিতও আমরা তন্মধ্যস্থ চর্বি খাই। ডিমের মধ্যেও কিছু চর্বি থাকে। তদ্ভিন্ন বাদাম, পেস্তা, আখরোট, ভুট্টা প্রভৃতির মধ্যেও যথেষ্ট তেল থাকে।

তেল ঘি প্রভৃতি হজম করিবার প্রক্রিয়াতে কিছু বিশেষত্ব আছে। সকলেই জানেন যে তেলে জলে কখনো মিশ খায় না, তেলমাত্রই বিন্দু বিন্দু আকারে জলের উপর ভাসিতে থাকে। আমরা যাহা কিছু তৈলাক্ত দ্রব্য খাই তাহাই পাকস্থলীতে গিয়া তরলীকৃত খাদ্যের উপর ঐরূপভাবে বিন্দু আকারে ভাসিতে থাকে। পাকস্থলী-রসেও লাইপেজ নামক এক-প্রকার জারক আছে, তৈলাদির উপর তাহার ক্রিয়া হইতে পারে। কিন্তু

তৈলবিন্দুগুলি যথেষ্ট সূক্ষ্ম না হইলে তাহার উপর উহার কিছু ক্রিয়া হয় না। অতএব দুধ ও ডিম ব্যতীত অধিকাংশ চর্বিজাতীয় খাদ্যই অপরিবর্তিত অবস্থায় পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে গিয়া প্রবেশ করে, এবং তথায় গিয়া উহা হজম হয়।

চর্বি হজম করিবার প্রথম প্রক্রিয়া উহাকে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুতে বিভক্ত করিয়া দেওয়া, কারণ বৃহৎ বৃহৎ বিন্দুর মধ্যে কোনো জারক প্রবেশ করিতেও পারে না এবং উহার রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটাইতে পারে না। এই বিভক্তির ক্রিয়া সম্পাদিত হয় কেবল পিত্তের দ্বারা। পিত্তমধ্যস্থ ক্ষারের (bile salts) এই গুণ আছে, এবং উহার সহিত মিশ্রিত হইলেই ঘি তেল প্রভৃতি ভাসমান বস্তু অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুতে বিভক্ত হইয়া অবদ্রবের (ইমাল্‌শন) অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ঠিক যেমনভাবে দুধের মধ্যে মাখন থাকে। তখন প্যাংক্রিয়াসের রসমধ্যস্থ ষ্টিয়াপ্‌সিন নামক জারক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা উহাকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসিরিনে পরিণত করে। অতএব তৈলাদি হজম করিতে দুইটি বস্তু নিতান্ত আবশ্যক,— পিত্ত ও প্যাংক্রিয়াসের জারক রস। পিত্তের অভাবে তৈলাদি খাদ্য আদৌ হজম হইতে পারে না। এইজন্যই যাহাদের পিত্তদোষ ঘটিয়াছে তাহাদের তৈলজাতীয় খাদ্য খাইতে চিকিৎসকেরা নিষেধ করেন।

এইরূপে হজম হইবার পরে অন্ত্রগাত্রস্থ ভিলাই কর্তৃক ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসিরিন শোষিত হইয়া লিম্ফের সহিত মিলিত হয়। তখন পুনরায় উহা সংযুক্ত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চর্বিবিন্দুতে পরিণত হয়। এই নূতন চর্বিভারাক্রান্ত লিম্ফের নাম কাইল্‌,— উহা দেখিতে ঘন দুধের মতো। উহা সরাসরি রক্তের সহিত মিশ্রিত না হইয়া ভিন্ন পথ দিয়া বহুদূর চলিয়া যায় এবং ধীরে ধীরে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। তৎপরে

সেই বিন্দুগুলি শরীরের নানাস্থানে সঞ্চিত হইয়া দেহের মেদ বৃদ্ধি করে।

চর্বিজাতীয় খাদ্য না খাইলে যে আমাদের একেবারে চলে না তাহা নয়, কারণ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার অভাবে মানুষ এবং অন্যান্য জীবও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তবে শীতপ্রধান দেশে ইহার অভাব ঘটিলে মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়ে। চর্বি খাদ্যের কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ আছে। ইহার ক্যালোরি-মূল্য অন্য দুই জাতীয় খাদ্য অপেক্ষা দ্বিগুণ, সুতরাং অল্প মাত্রাতেই ইহা শরীর গরম করিতে ও দ্বিগুণ মাত্রায় ইন্ধন জোগাইতে পারে। চর্বিখাদ্য শরীরে ইন্ধন সঞ্চয় করিবার পক্ষে অদ্বিতীয়। ইহা শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে এবং শরীরস্থ প্রোটিন বস্তুকে রক্ষা করে। দ্বিতীয়ত, চর্বির সঙ্গে আমরা ভিটামিন এ এবং ডি গ্রহণ করিয়া থাকি, উহার অভাবে ঐ ভিটামিন দুইটির অভাব ঘটিতে পারে। তৃতীয়ত, চর্বিবিহীন খাদ্য শীঘ্রই পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে নামিয়া যায়, সুতরাং যত পরিমাণেই খাওয়া হউক, অল্পক্ষণ পরেই আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। চর্বিযুক্ত খাদ্য খাইলে অনেক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরিয়া থাকে, এবং অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় খাইবার ইচ্ছা হয় না। তবে চর্বি জাতীয় জিনিস অধিক পরিমাণে খাইতে নাই, উহা খাইতে হইলে কার্বোহাইড্রেটের সহিত মিশাইয়া খাওয়া উচিত। অধিক খাইলে উহা নিজেও হজম হয় না, এবং অন্যান্য খাদ্য হজম করা সম্বন্ধেও বিঘ্ন ঘটায়। চর্বিজাতীয় খাদ্যের মধ্যে মাংসের চর্বি সর্বাপেক্ষা দুষ্পাচ্য, এবং মাখন সর্বাপেক্ষা সহজপাচ্য।

শাকসবজি ও ফলমূল

পূর্বেই বলিয়াছি যে আমরা ভাত রুটি প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট খাদ্য খাইয়া থাকি শরীরকে খাটিবার শক্তি জোগাইবার জন্য, মাছ মাংস প্রভৃতি প্রোটিন খাইয়া থাকি উহার গঠন বজায় রাখিবার জন্য, তেল ঘি প্রভৃতি স্নেহপদার্থ খাইয়া থাকি শরীরের তাপ রক্ষা করিবার জন্য,— কিন্তু শাক-সবজি, ফলমূল, আনাজ তরকারি, এগুলি আমরা কেন খাই। কেবল কি রসনা তৃপ্তির জন্য। পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে পূর্বোক্ত খাদ্যগুলির ন্যায় পুষ্টিকর বস্তু এইগুলির মধ্যে খুব অল্প পরিমাণেই থাকে। প্রোটিন যদি থাকে তো নিতান্ত যৎসামান্য, কার্বোহাইড্রেট কোনো কোনো তরকারির মধ্যে হয়তো সামান্যই কিছু পাওয়া যাইবে, এবং তৈলাদি স্নেহপদার্থের কোনো সম্পর্কও প্রায় নাই।

রসনাতৃপ্তির কথা ছাড়িয়া প্রয়োজনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে শাকসবজি ও ফলবর্গীয় উদ্ভিজ্জ খাদ্যগুলি আমাদের শরীরের কোনো স্থূল অভাব মেটায় না বটে, কিন্তু উহা সমস্ত শরীর-কার্যের একটা আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা রাখিবার সহায়তা করে এবং শরীরযন্ত্রকে সুনিয়মিতভাবে পরিচালিত করিয়া থাকে। অর্থাৎ উহার অভাবে শরীরের অন্যান্য খোরাক যথেষ্ট জুটিলেও হঠাৎ কল বিগড়াইয়া যাইতে পারে এবং অন্য দিক দিয়া শরীর অসুস্থ হইতে পারে। বস্তুত শরীরের কয়েকটি স্থূল খাদ্য-প্রয়োজন ছাড়াও উহার বহুবিধ সূক্ষ্ম অভাব আছে। কিন্তু সেগুলি সূক্ষ্ম হইলেও শরীরকে সুস্থ রাখার পক্ষে তাহার প্রত্যেকটি অভাব পূরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। বিবিধ প্রকারের তরিতরকারি ও বিভিন্ন ঋতুর ফলমূলের দ্বারা সেই কাজ হয়। আমরা যে খাদ্যকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করিয়া থাকি, প্রয়োজনের দিক দিয়া তাহার এই সার্থকতা।

এই সকল বিচিত্র আস্বাদযুক্ত খাদ্যপদার্থের মধ্যে মূলত কী কী উপাদান আছে তাহা দেখা যাক। শাকসবজি বলিতে যাহা বুঝি তাহা অধিকাংশই পাতা এবং ডাঁটা। কাঁচা তরকারি বলিতে যাহা বুঝি তাহার উপরে থাকে খোসা, এবং ভিতরে কিছু শাঁস। এই শাঁসের মধ্যে অধিকাংশই কেবল জল, নামমাত্র থাকে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট। পাকা ফলের মধ্যেও তাই, অধিকন্তু থাকে কিছু শর্করা। কিন্তু এ ছাড়া ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা অতিরিক্ত থাকে, তাহা তিন প্রকার—(১) অপাচ্য সেলুলোজ, (২) লবণাদি ক্ষার-জাতীয় পদার্থ, (৩) নানাবিধ ভিটামিন। এইগুলি আমাদের কোন্ উপকারে আসে, তাহা একে একে বুঝিতে হইবে।

সেলুলোজ

প্রথমোক্ত সেলুলোজ বলিতে এমন কার্বোহাইড্রেট বুঝায় যাহা আমরা হজম করিতে পারি না, এবং খাইলেও যাহা অপরিবর্তিত অবস্থায় মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই সেলুলোজ থাকে প্রত্যেক উদ্ভিজ্জ এবং ফল-তরকারির খোসায় ও তাহার ভিতরকার বীজে, এবং আরো থাকে শস্যগাত্রস্থ ভুষিতে। তরকারির খোসা, শস্যের ভুষি, এমন কি খড় পর্যন্ত খাইয়া গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তু অনায়াসে হজম করে এবং উহার সেলুলোজ হইতে পুষ্টি সংগ্রহ করে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা অসাধ্য। সেইজন্য ফল ও শস্যাদি হইতে সেলুলোজ মাত্রই আমরা ফেলিয়া দিতে চাই, কিন্তু সম্পূর্ণ ফেলিতে পারি না, কিছু কিছু খাইয়া থাকি। খাদ্য হিসাবে ইহা অসার পদার্থ, কিন্তু তবুও ইহাতে আমাদের প্রয়োজন আছে, কারণ অসার হইলেও ইহা সারক। হজম না হইয়া ইহা অপরিবর্তিত অবস্থায় নিম্ন অন্ত্রে চলিয়া যায় এবং তথায় গিয়া

মলের পরিমাণ ও ওজন বৃদ্ধি করে, সুতরাং চাপের দ্বারা বেগ আনিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কারের সহায়তা করে।

লবণাদি ক্ষার

দ্বিতীয়ত পার্থিব লবণাদি আমাদের শরীরকে গঠন করিবার পক্ষে এবং শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়াসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করিবার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। মনুষ্যশরীরের যে-কোনো অংশ পোড়াইয়া একেবারে ছাই করিয়া ফেলা যাক, ঐ ছাই লইয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে উহার মধ্যে সোডিয়ম, পটাসিয়ম, ক্যালসিয়ম ম্যাগনিসিয়ম, ফস্‌ফরাস্‌, সালফার, লৌহ প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের ক্ষার রহিয়াছে। অতএব উহা আমাদের শরীরে জীবিতাবস্থাতেই থাকে এবং এইগুলি আমাদের শরীরের কতকগুলি বিশিষ্ট ক্রিয়া যথারীতি চালনা করে। ক্যালসিয়ম ব্যতীত হাড় প্রস্তুত হয় না, মাংসপেশীর কুঞ্চন হয় না, হার্টের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয় না, এবং রক্তের জমাট বাঁধিবার শক্তি থাকে না। ফস্‌ফরাস ব্যতীত কার্বোহাইড্রেটের ইন্ধন জ্বলে না, ও জীবকোষসমূহের এবং স্নায়ুমণ্ডলীর স্বাভাবিক ক্রিয়া হইতে পারে না। যদি রক্তকণিকার মধ্যে লৌহ না থাকে, তবে উহা ফুস্‌ফুস্‌ হইতে অক্সিজেন লইয়া শরীরস্থ প্রত্যেক কোষে সরবরাহ দিতে পারে না। সোডিয়ম পটাসিয়ম প্রভৃতি না থাকিলে রক্তের ক্ষারগুণ কমিয়া যায় এবং উহা তখন বিষাক্ত হইয়া যায়। অতএব যদিও এই সকল পদার্থ শরীরের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাত্রাতেই থাকে, তবু যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু না থাকিলে জীবন-সংশয় হইয়া পড়ে। এগুলি শরীর হইতে প্রত্যহ মলমূত্রাদির সহিত বহির্গত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং খাদ্যের মধ্য দিয়াই উহার অভাব প্রত্যহ পূরণ করিতে হইবে। দুধ, ডিম এবং মাছ, মাংস প্রভৃতি খাদ্যের মধ্যেও ক্যালসিয়ম, ফস্‌ফরাস্‌,

লৌহ প্রভৃতি আছে বটে কিন্তু সবগুলি নাই, এবং ঐ সকল দুর্মূল্য খাদ্য সকলের ভাগ্যে সব সময় জোটে না। কিন্তু সহজলভ্য শাকসবজি ও ফলমূলের মধ্যে এই সকল বস্তু উপযুক্ত মাত্রায় আছে। ক্যালসিয়ম আছে—বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালংশাক, গাজর, বরবটি প্রভৃতির মধ্যে এবং সকল প্রকার লেবুতে। লৌহ আছে—সকল প্রকার শাকসবজিতে ও বিশেষত বরবটি, কলাইশুঁটি, শিম, পালংশাক, কাঁচকলা, আটা, ময়দা, এবং পেস্তা, বাদাম, খেজুর, আখরোট প্রভৃতির মধ্যে। ফস্‌ফরাস্ থাকে—বরবটি, কলাইশুঁটি, আটা, ও খেজুর, এবং বাদামের মধ্যে। এইরূপে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় লবণাদি শাকসবজি ও তরকারি প্রভৃতিতে কিছু কিছু মাত্রায় বর্তমান থাকে এবং তাহার দ্বারাই আমাদের শরীরের দৈনন্দিন অভাবটুকু মিটিয়া যায়।

ভিটামিন

অতঃপর ভিটামিনের কথা। ভিটামিন সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা কিছু অতিরঞ্জিত হইয়া আছে। আমরা শরীরের পুষ্টির কোনো ব্যতিক্রম দেখিলেই এখন বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি যে, খাদ্যে ভিটামিনের অভাব ঘটিয়াছে, এবং মনে মনে কল্পনা করিয়া থাকি যে, কেবল ভিটামিনযুক্ত খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পারিলেই আর কোনো চিন্তা নাই, তাহাতেই আমরা সকল বিষয়ে সুস্থ ও সবল থাকিতে পারিব। কিন্তু ইহা অতিশয়োক্তি। খাদ্যমধ্যস্থ যে-কয়েকটি বিভিন্ন প্রকার মুখ্যবস্তু আমাদের শরীর রক্ষার জন্য নিত্য প্রয়োজন, ভিটামিন তাহার মধ্যে একটিমাত্র, সুতরাং অন্যান্যগুলির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আবশ্যক। ভিটামিন বাদ দিয়া কেবল প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট খাইলেই লোকে যেমন সুস্থ থাকিবে না, ঐগুলি বাদ দিয়া কেবল

ভিটামিনযুক্ত খাদ্য খাইলেও লোকে তেমনি জীবিত থাকিবে না। ভিটামিনকে আমরা খাদ্যপ্রাণ বলি, কিন্তু সকল খাদ্যের মধ্যেই যে ভিটামিন আছে এরূপ নয়। ইহা সাধারণত উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে, দুধে, ডিমে ও জান্তব-যকৃতের মধ্যেই থাকে। মাংস, ময়দা, আলু, তৈলাদি এবং শর্করাদির মধ্যে ইহা প্রায় থাকেই না। সাধারণত কেবল কয়েকপ্রকার টাটকা খাদ্যের মধ্যেই ইহা অতি সূক্ষ্মভাবে এবং সূক্ষ্ম মাত্রায় বর্তমান থাকে, এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা এখন ইহার রাসায়নিক অস্তিত্বও প্রমাণ করিতে পারা যায়। এতকাল এই ভিটামিন-গুলিকে খাদ্য হইতে পৃথক করা যাইত না, কিন্তু সম্প্রতি তাহাও সম্ভবপর হইয়াছে। ভিটামিন শরীরের কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ করে না, কিন্তু উহা শরীরকে এমন ভাবে সঞ্জীবিত রাখে, যাহাতে তাহার আভ্যন্তরিক্ ক্রিয়াসমূহ সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে। ভিটামিনের প্রয়োজন কোনোরূপ স্থূলমাত্রার দ্বারা নিরূপিত হয় না, অতি সামান্য মাত্রাতে খাইলেও ইহার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। মনুষ্যশরীরে ইহার অভাবও কোনো মাপজোখ বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা ধরিতে পারা যায় না, ইহার অভাব অভিব্যক্ত হয় কেবলমাত্র কয়েকটি রোগের দ্বারা ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যতিক্রম দ্বারা।

ভিটামিন এক প্রকার নয়, এতাবৎ মোট ছয় প্রকার ভিটামিন সাধারণপক্ষে স্বীকৃত হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরো হইতে পারে। ইংরেজি বর্ণমালার অক্ষরগুলি দিয়া এই সকল ভিটামিনের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র নামকরণ করা হইয়াছে। এইগুলির গুণের পরিচয় দিতে হইলে কোন্ কোন্ ভিটামিনের অভাবে কী কী রোগ জন্মায় তাহাই দেখিতে হইবে। কোন্ খাদ্যের মধ্যে কোন্ প্রকার ভিটামিন আছে তাহাও জানা যায় ঐরূপ প্রত্যক্ষ উপায়ে, অর্থাৎ যে ভিটামিনের অভাবে যে রোগটি

জন্মিয়াছে উহা যদি কোনো খাদ্যের ব্যবহারের দ্বারা আরোগ্য হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায় যে সেই খাদ্যের মধ্যে ঐ বিশিষ্ট প্রকারের ভিটামিন আছে।

ভিটামিন এ—ইহার অভাবে মানুষকে সহজে নানাবিধ সংক্রামক রোগে ধরে, শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেজ এবং স্ফূর্তি কমিয়া যায়, মানুষ রাতকানা হয় ও শিশুদের নানাবিধ চোখের রোগ জন্মায়। এই ভিটামিন দুধ, গাওয়া ঘি, মাখন, দধি, ডিম, বৃহৎ মাছের তেল এবং জান্তব-যকৃতে যথেষ্ট আছে। তদ্‌ব্যতীত উদ্ভিজ্জের মধ্যে গাজরে এবং বাঁধাকপি, রাঙাআলু, পালংশাক, শালগম শাক, লেটুস শাক, কলাইশুঁটি, টোমাটো প্রভৃতির মধ্যে একরূপ পদার্থ পাওয়া যায় তাহার নাম ক্যারোটিন, উহা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিটামিনএ প্রস্তুত করিতে পারে। **ভিটামিন বি ১** এবং **ভিটামিন বি ২**—প্রথমটির অভাবে বেরিবেরি, স্নায়ুপ্রদাহ, স্নায়ুদৌর্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং নানাবিধ পেটের দোষ জন্মায়। এই ভিটামিনের বিশেষত্ব এই যে যাহারা কম কার্বোহাইড্রেট খাদ্য খায় তাহাদের পক্ষে ইহা অতি অল্পই প্রয়োজন, কিন্তু যাহারা যত অধিক কার্বোহাইড্রেট খাইবে তাহাদের পক্ষে ইহা তত অধিক প্রয়োজন। আমরা বাঙালি জাতি যেহেতু ভাত খাইয়াই জীবনধারণ করি, সেই হেতু আমাদের ইহা কিছু অধিক মাত্রায় প্রয়োজন, এবং ইহার অভাবেই সম্ভবত নানারূপ পেটের রোগে ভুগিয়া থাকি। দ্বিতীয়টির অভাবে চর্মরোগ এবং পেলাগ্রা নামক এক প্রকার রোগ জন্মায়। এই ভিটামিন দুইটি সাধারণত চাল, ডাল, যব, গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের ভুষিতে থাকে। ভাতের ফ্যানে এবং মারমাইট ও বিম্যাক্স নামক কৃত্রিম খাদ্যের মধ্যে ইহা যথেষ্ট মাত্রায় থাকে। তদ্‌ব্যতীত দুধ, ডিম, জান্তব-যকৃত, এবং পালং-

শাক, শালগম শাক, শতমূলী, শিম, বাঁধাকপি, লেটুসশাক সেলারি, কলাইশুঁটি, নারিকেল শাঁস, চীনাবাদাম, আখরোট প্রভৃতির মধ্যে ইহা আছে। ভাত যাহাদের প্রধান খাদ্য তাহাদের পক্ষে এই ভিটামিন অবশ্য খাওয়া উচিত। **ভিটামিন সি**— ইহার অভাবে রক্তের ঘনত্ব কমিয়া গিয়া দেহের রক্তপাতপ্রবণতা বাড়াইয়া দেয়, চর্মের নানাস্থানে রক্তপাত হইয়া কালসিটা পড়ার মতো দাগ দেখা যায়, স্কার্ভি নামক রোগ জন্মায়, দাঁতের গোড়া পানসে হয়, এবং গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা হয়। এই ভিটামিন কেবলমাত্র টাটকা ফল এবং শাকসবজিতেই প্রচুর থাকে। ইহা টোমাটো, পালংশাক, বাঁধাকপি, ফুলকপি, কলাইশুঁটি, লেটুসশাক, আলু এবং শাঁক আলু, মুলার শাক ও মুলা, শালগম, পিঁয়াজ, প্রভৃতিতে এবং কাঁচা ঘাসে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ফলের মধ্যে কমলালেবু ও পাতিলেবুতে এবং কলা, কালোজাম, বেল, শসা, পেয়ারা, আম, লিচু, পেঁপে, আনারস, পীচফল, পানিফল, প্রভৃতিতে এই ভিটামিন আছে। কিন্তু কেবল ঐ সকল ফল ও তরকারির টাটকা অবস্থাতেই ইহা অবিকৃত থাকে, শুকাইয়া গেলে এবং অগ্নিতাপে রন্ধন করিলেই ইহা নষ্ট হইয়া যায়। আমরা যে সকল আনাজ তরকারি রাঁধিয়া খাই তাহাতে অন্যান্য ভিটামিন অবিকৃত অবস্থায় থাকিলেও এইটি থাকে না। সেইজন্য এই জাতীয় ভিটামিন খাইতে হইলে টাটকা ফল ও কাঁচা তরকারি খাওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশে কাঁচা শাক খাওয়ার রীতি নাই, কিন্তু পাশ্চাত্যদেশের লোকেরা পেঁয়াজ মুলা টোমাটো প্রভৃতি কাঁচাই খায়। আমাদের দেশেও বিহারীরা মুলার শাক, ছোলার শাক প্রভৃতি কাঁচা অবস্থায় খাইয়া থাকে। কাঁচা টোমাটোর রস সরবতের মতো করিয়া আমরা অনায়াসেই খাইতে পারি। আর-একটি সস্তা দরের সাধারণ ফলের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাহা আমলকী। ইহার

মধ্যে যতটা ভিটামিন সি আছে তাহা বোধ হয় অন্য কোনো ফলে নাই। দুইটি কমলালেবুতে যতখানি ভিটামিন সি পাওয়া যায়, একটিমাত্র আমলকীতে তাহা পাওয়া যায়। আর-একটি বিশেষ সুবিধার কথা এই যে শুকাইয়া রাখিলেও ইহার ভিটামিন নষ্ট হয় না। সেইজন্য যেখানে টাটকা শাকসবজি দুষ্প্রাপ্য সেখানে আমলকী শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া তাহার বড়ি প্রস্তুত করিয়া সৈনিকদের খাইতে দেওয়া হয়। **ভিটামিন ডি**—ইহার অভাবে ছেলেমেয়েদের হাড় এবং দাঁত ভালো করিয়া পুষ্ট হয় না, শরীরের গঠন ভালো হয় না, দাঁতে পোকা হয়, শরীর শীর্ণ হইয়া রিকেট্‌স নামক রোগ জন্মায়, এবং রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহা বিশেষ করিয়া শিশুদের পক্ষেই আবশ্যক। এই ভিটামিন জান্তব-যকৃতে কডলিভার তৈলে ও মুরগির ডিমের হরিদ্রা অংশে প্রচুর আছে। মাঠে চরা গোরুর দুধে এবং গব্য ঘৃতে ইহা আছে, কিন্তু কোনো শাকসবজির মধ্যে এই ভিটামিন নাই। **ভিটামিন ই**—স্ত্রীলোকদের সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বাড়ায় এবং ইহার অভাবে গর্ভ নষ্ট হইতে দেখা যায়। গমের অঙ্কুরে, ভুট্টায়, লেটুস শাকে, তেলে (ওলিভ প্রভৃতি) এবং দুধে ও ডিমে এই ভিটামিন আছে। **ভিটামিন কে**—ইহার অভাবে শরীর হইতে অযথা রক্তক্ষয় হইতে পারে। এই প্রকারের ভিটামিন জান্তব-যকৃতের তেলে পাওয়া যায়।

দুধ ও দুগ্ধজ খাদ্য

মানুষের খাদ্য বলিতে গেলে জগতে যত প্রকার সামগ্রী আছে উহার প্রত্যেকটিকেই কোনো-না-কোনো উপায়ে আমাদের খাইবার উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু প্রকৃতি উহার মধ্যে এমন দুইটি

বস্তু সৃষ্টি করিয়াছে যাহা একেবারে স্বাভাবিক অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য। এই দুইটি বস্তু দুধ এবং মধু। প্রকৃত স্বভাবজাত খাদ্য বলিতে এই দুইটিকে বুঝায়।

আমাদিগের মধ্যে সাধারণত অন্যান্য জন্তুর দুধ অপেক্ষা গোরুর দুধের ব্যবহারই প্রশস্ত। মানুষের দুধে গোরুর দুধ অপেক্ষা জলের ও শর্করার পরিমাণ বেশি, আর গোরুর দুধে মানুষের দুধ অপেক্ষা মাখন ও ছানার পরিমাণ বেশি। সুতরাং গোরুর দুধের সহিত কিছু পরিমাণ জল এবং চিনি মিশাইয়া দিলেই উহা মানুষের দুধের সমান হইয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দুধকে আমরা পানীয় বলিব না, কারণ যদিও উহা স্বাভাবিক অবস্থায় দেখিতে তরল এবং যদিও উহা না চিবাইয়া জলের মতো চুমুক দিয়াই পান করিতে হয়, তথাপি পাকস্থলীতে প্রবেশ করিবামাত্রই ছানা কাটিয়া উহার অধিকাংশ কঠিন হইয়া যায় এবং তৎপরে উহা অন্যান্য কঠিন খাদ্যের মতোই পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে হজম হইতে থাকে।

দুধকে কেবলমাত্র খাদ্য বলিলেই যথেষ্ট হইল না, উহা একটি 'সম্পূর্ণ খাদ্য', সুতরাং আমাদের খাদ্যের আদর্শ-স্থানীয়। 'সম্পূর্ণ খাদ্য' বলিবার অর্থ এই যে, উহার মধ্যে সকল জাতীয় খাদ্যের মুখ্য বস্তুগুলি একাধারে বর্তমান, সুতরাং নানা পর্যায়ের খাদ্যবস্তু একত্রিত করিয়া খাইলেও যে সম্পূর্ণ-পুষ্টির ফল পাওয়া যায়, কেবলমাত্র দুধ খাইলেও সেই ফল পাওয়া যায়।

সুশ্রুতঋষিও এই কথা বলিয়াছিলেন যে, দুধের মধ্যে সর্ববিধ আহারীয় দ্রব্যের সারাংশ থাকে, এবং দুধের এই বিশিষ্ট গুণকে তিনি সাত্ম্যগুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। দুধের মধ্যে কিছু প্রোটিন আছে, কিছু কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ শর্করা আছে, কিছু স্নেহপদার্থ বা চর্বি আছে,

ধাতব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়ম, পটাসিয়ম, সোডিয়ম, ফস্‌ফরাস, ম্যাগনিসিয়ম প্রভৃতির নানারূপ লবণাদি আছে, ভিটামিন যত প্রকারের আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সবগুলিই আছে, এবং অধিকন্তু যথেষ্ট পরিমাণে জল আছে। সুতরাং আমাদের শরীর রক্ষার জন্য যে সকল জিনিসের অতি আবশ্যক তাহার সবগুলিই ইহাতে সম্মিলিত হইয়া আছে। তাহা না থাকিলে শিশু জন্মাবধি বহুকাল পর্যন্ত কেবলমাত্র দুধ খাইয়াই এমন সর্বাঙ্গীণভাবে পুষ্ট হইয়া উঠিতে পারিত না।

অনেকে মনে করেন যে, দুধ কেবল শিশুর খাদ্য এবং রোগীর পথ্য হিসাবেই ব্যবহার্য, কিন্তু বস্তুত তাহা নয়, ইহা খাদ্য হিসাবে প্রত্যেকের পক্ষেই ব্যবহার্য।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দুধ খাইলেই যদি খাদ্যের সকল প্রয়োজন মিটিয়া যায়, তবে আর আমরা অন্য খাদ্য খাই কেন। তাহার উত্তর এই যে, প্রথমত যতটা পরিমাণ দুধ খাওয়া প্রয়োজন ততটা খাওয়া বয়স্কদের পক্ষে অসুবিধাজনক এবং খাইলেও হজম করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত দুধে কার্বোহাইড্রেট থাকিলেও উহার পরিমাণ অল্প, সুতরাং আমাদের পরিশ্রমের ইন্ধন জোগাইতে যতটা কার্বোহাইড্রেটের আবশ্যক দুধের দ্বারা তাহার চাহিদা মিটাইতে হইলে উহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক মাত্রায় পান করিতে হয়।

খ্যাতনামা রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক পাভলোভ উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দুধ হজম করিবার জন্য অধিক পরিপাকশক্তির প্রয়োজন হয় না, অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় ইহাকে হজম করিতে অল্পই পাচক রসাদির প্রয়োজন হয়। এমন কি শিরার মধ্যে ইন্‌জেকশন করিয়া দিয়া দুধ যদি একেবারে রক্তের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যায়, তবে পেটে গিয়া পরিপাক না হওয়া সত্ত্বেও উহা শরীরের মধ্যে গৃহীত

হইয়া যায়। এই সকল কারণে বর্তমান সভ্যজগতের দৃষ্টি দুধের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে এবং দুধের ব্যবহারও পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সুইডেন ও ডেনমার্কের অধিবাসীরা মাথা পিছু গড়পড়তায় প্রায় তিনপোয়া করিয়া দুধ প্রত্যহ খায়। আমেরিকায় প্রত্যেকে গড়পড়তায় প্রায় আধসের করিয়া এবং বিলাতের লোকেরা প্রত্যেকে গড়ে একপোয়া করিয়া দুধ খায়। কিন্তু ভারতবর্ষে? হিসাব লইয়া যদি দেখা যায় তবে গড়পড়তায় তাহা সিকি ছটাক করিয়াও হইবে কি।

শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে হইলে প্রত্যহ অন্তত একসের করিয়াই দুধ খাওয়া উচিত, তাহার কমে অভিপ্রেত ফল পাওয়া যায় না। দুই তিন দফায় অল্প করিয়া দৈনিক একসের দুধ অনায়াসে খাওয়া যায়।

দুধের মধ্যে দুই জাতীয় প্রোটিন আছে, তন্মধ্যে একটির নাম ল্যাক্‌টালবুমেন, অপরটির নাম কেসীনোজেন বা কেসীন। ল্যাক্‌টাল-বুমেন কথার অর্থ দুধের অ্যালবুমেন, উত্তাপ লাগিলেই উহা ডিমের অ্যালবুমেনের মতো জমিয়া যায়, এবং ফুটাইয়া রাখিলে উহা সরের সহিত উপরে ভাসিয়া উঠে। দ্বিতীয় প্রকার প্রোটিনের বিশেষত্ব এই যে অম্লের সংস্পর্শে আসিলেই উহা তৎক্ষণাৎ জমাট বাঁধিয়া পৃথক হইয়া যায়, উহাকে আমরা ছানা বলি। পাকস্থলীর পাচক রসের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আছে, উহার সংস্পর্শে আসিলেই দুধ তৎক্ষণাৎ ছানা কাটিয়া যায় এবং জল ও ছানা পৃথক হইয়া যায়। এই ছানার দলা যত কঠিন হয় ততই উহা হজম করা কঠিন হয়, দলাগুলি যত সূক্ষ্ম হয় ততই উহা হজম করা সহজ হয়। সেইজন্য দুধ ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করার পরিবর্তে চিকিৎসকেরা উহা ধীরে ধীরে চুমুক দিয়া পান করার উপদেশ দেন, এবং যাহাতে ছানার দলা শক্ত হইয়া বাঁধিতে না পারে

এজন্য রোগীদিগকে দুধ জল মিশাইয়া পাতলা করিয়া লইয়া অথবা সাগু-বালি প্রভৃতির পালো মিশাইয়া পান করিতে বলেন।

দুধের মধ্যে যে স্নেহপদার্থ থাকে উহার নাম ননি। ইহা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তৈলবিন্দুর মতো অবদ্রব অবস্থায় দুধের সর্বাংশে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পাত্রের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলেই ইহার কতক অংশ উপরে ভাসিয়া ওঠে এবং মাঠাতোলা যন্ত্র দিয়া দুধ টানিলেই ইহাকে পৃথক করিয়া লওয়া যায়।

এই ননি অতি উপাদেয় খাদ্য, ইহার মধ্যে লেসিথিন নামক একরূপ পদার্থ থাকে যাহা দিয়া আমাদের মস্তিষ্ক গঠিত হয়।

এই ননি মন্থন করিয়া মাখন প্রস্তুত হয় এবং তাহা হইতে ঘৃত হয়। মাখনের মধ্যে যে স্নেহপদার্থ থাকে তাহার নাম ওলীন। তদ্ব্যতীত দুধের অনেকটা কেসীনও মাখনের সহিত থাকিয়া যায়। আমরা মনে করি মাঠাতোলা দুধে সার পদার্থ কিছু নাই, কারণ মাখন তুলিয়া লইলেই সমস্ত সার পদার্থ টুকু উহার সহিত চলিয়া গেল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। উহাতেও কিছু পরিমাণ মাখন এবং কেসীন থাকিয়া যায়, সবটুকু তুলিয়া লওয়া যায় না। যাহারা স্বাভাবিক দুধ হজম করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে এবং হজমশক্তিহীন দুর্বল শিশুদের পক্ষে এই মাঠাতোলা দুধ উপকারী।

দুধের ছানা কাটিয়া গেলে যে জলটুকু পৃথক হইয়া যায় উহাকে আমরা ছানার জল বলি। ইহাই দুধের জলীয় অংশ। ছানা কাটাইলে দুধের কেসীন এবং মাখন জমিয়া গিয়া ঐ ছানার মধ্যেই থাকিয়া যায়, কিন্তু দুধের কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা এবং ধাতব লবণাদি উহার মধ্যে প্রবেশ করে না। এইগুলি দ্রবণীয় পদার্থ সুতরাং এইগুলি ছানার জলের মধ্যেই দ্রবীভূত হইয়া থাকে। দুধের শর্করার নাম সুগার অফ মিল্ক

অথবা ল্যাকটোজ। ইহার মিষ্টতা অন্যান্য শর্করা অপেক্ষা অনেক কম, কিন্তু ইহার কার্বোহাইড্রেটগুণ যথেষ্ট এবং দুধ খাইলে ইহাই সর্বাগ্রে হজম হইয়া যায়, ছানা হজম হইতে অনেক সময় লাগে।

দুধের মধ্যে কিছু চুন আছে, উহার নাম ক্যালসিয়ম ফস্‌ফেট। এই চুন আমাদের পক্ষে এবং বিশেষ করিয়া রোগীদের ও শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দুধ খাইলে অনেকেরই কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু কাহারো কাহারো কোষ্ঠকাঠিন্য হইতেও দেখা যায়। এই চুনই তাহার কারণ এবং দুধ যতই অধিক জাল দেওয়া যায় ততই উহার চুনের অংশ বাড়িয়া যায়। কাঁচা দুধে চুন কম থাকে বলিয়া উহা কোষ্ঠ-কাঠিন্য আনিতে পারে না।

অনেকের পক্ষে দুধ সহজে হজম হয় না। তাহাদের জন্যও নানারূপ ব্যবস্থা আছে। দুধকে যদি কৃত্রিম উপায়ে সূক্ষ্মভাবে ছানা কাটাইয়া লইয়া তৎপরে উহা পান করা যায় তাহা হইলে উহা পেটে গিয়া শক্ত দলা বাঁধিতে পারে না, সুতরাং হজমের বিঘ্ন হয় না। দুধের মধ্যে অল্প পরিমাণ সোডা সাইট্রেট (প্রতি আউন্সে ২ গ্রেণ মাত্রায়) মিশাইয়া দিয়া উহা পান করিলে তাহা সহজে হজম হয়।

যে সকল রোগীর হজমশক্তি কমিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য চিকিৎসকেরা ছানাকাটা দুধের ব্যবস্থা করেন। ছানাকাটা দুধের অর্থ দুধকে অতি সূক্ষ্মভাবে ফাটাইয়া সেই অবস্থাতেই উহা পান করিতে দেওয়া, যাহাতে পাকস্থলীতে গিয়া আর দ্বিতীয়বার ছানা কাটাইবার প্রয়োজন না হয়। ফুটন্ত দুধে কিছু পরিমাণ ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড বা লেবুর রস বা কাঁচা পেঁপে প্রয়োগ করিলে উহা এইরূপ সূক্ষ্মভাবে ছানাকাটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

যাহাদের দুধ কিছুতেই হজম হয় না তাহাদের জন্য উহা কৃত্রিম

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা হজম করাইয়া লইয়া তৎপরে পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম পেপ্‌টোনাইজ্‌ করা। ইহার জন্য অগ্ন্যাশয়ের জারকরস মিশ্রিত একরূপ পেপ্‌টোনাইজিং পাউডার পাওয়া যায়। উহা দুধের সহিত মিশাইয়া সেই দুধের পাত্রটি গরম জলের মধ্যে কিছুক্ষণ বসাইয়া রাখিলেই দুধের প্রোটিন অংশ অর্থাৎ কেসীন হজমের প্রণালীতে পরিবর্তিত হইয়া পেপ্‌টোন হইয়া যায়। বেঞ্জার্স ফুড নামক একরূপ বিলাতী ফুড রোগীদের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাও দুধের সহিত মিশ্রিত করিলে দুধ ঐরূপ কৃত্রিমভাবে হজম হইয়া যায় এবং তাহা হজম করিতে রোগীকে আদৌ কোনোরূপ প্রয়াস করিতে হয় না।

দুধ যত শীঘ্র দূষিত হইতে পারে এমন আর কোনো খাদ্যই নয়। যতই সাবধানে রাখা যাক, দোহনের পর কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলেই উহার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে এবং সে দুধ জ্বাল দিয়া না লইলে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী হয়। তাহার কারণ দুধ যেমন জীবমাত্রেরই পক্ষে উপাদেয় খাদ্য, তেমনি নানারূপ রোগবীজাণুর পক্ষেও উপাদেয় খাদ্য। দুধের মধ্যে একবার কোনোরূপে প্রবেশ করিতে পারিলেই ঐ সকল বীজাণু পুষ্ট হইয়া সংখ্যাবৃদ্ধি ও প্রসারলাভ করিতে থাকে এবং ঐরূপ জীবিত অবস্থায় মানুষের পেটের ভিতর প্রবেশ করিলে সহজেই নানারূপ রোগের সৃষ্টি করিতে পারে। এইজন্যই দুধ একবার জ্বাল দিয়া না লইয়া খাওয়া উচিত নয়। বেশি ফুটাইবার আবশ্যক হয় না, এক বলকা ফুটাইয়া লইলেই উহা নির্দোষ হইয়া যায়।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাখিতে হইলে দুধ কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দেওয়া উচিত। বরফের মধ্যে রাখিতে পারিলে অথবা রেফ্রিজারেটার যন্ত্রের মধ্যে রাখিলে উহা তিন চারি দিন পর্যন্ত রাখা যায়। উত্তমরূপ

হাওয়া লাগিতে দিলেও দুধ সহজে নষ্ট হয় না। বৈকালের দুধ যদি সমস্ত রাত্রি কোনো খোলা জায়গায় কেবল সূক্ষ্ম জালের ঢাকনি দিয়া রাখিয়া দেওয়া যায় তবে পরদিন উহা জ্বাল দিয়া লইয়া অনায়াসে ব্যবহার করা যায়।

আজকাল দুধকে শুষ্ক গুঁড়ায় পরিণত করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং তাহা উত্তমরূপে আঁটা টিনের মধ্যে আমেরিকা ও সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি হইতেছে। গুঁড়া অবস্থায় থাকে বলিয়া উহা সহজে নষ্ট হয় না এবং দুধের সমস্ত গুণই উহার মধ্যে মোটামুটি বর্তমান থাকে। দুধের ভিটামিন সি মাত্র উহাতে নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যাহারা গুঁড়া খাইবে তাহারা উপরন্তু কিছু কমলালেবুর রস বা টোমাটোর রস খাইলেই ঐ ক্ষতিটুকু পূরণ হইয়া যাইবে। এই কারণে বর্তমান সভ্যজগতে বালক-বালিকাদের গুঁড়া দুধ খাওয়ানোই ক্রমশ প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। ইহার একটা সুবিধা এই যে, যাহারা সাধারণ গোরুর দুধ হজম করিতে পারে না তাহারা গুঁড়া দুধ বেশ হজম করিতে পারে। ভবিষ্যতে ইহার প্রচলন আরো বাড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

দুধ হইতে আমরা যে সকল খাদ্য কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করি তন্মধ্যে দধিই সর্বজনপ্রিয়। ঈষদুষ্ণ দুধের সহিত কিছু দধিবীজ বা দম্বল মিশাইয়া গরম জায়গায় রাখিয়া দিলেই কয়েক ঘণ্টা পরে উহা দধিতে পরিণত হয়। দধিবীজের মধ্যে দধি-বীজাণু বা ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড ব্যাসিলাই থাকে। এই সকল বীজাণু দ্বারা দুধের শর্করা গাঁজিয়া গিয়া ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। উহাই তৎপরে দুধের ছানাকে সূক্ষ্ম-ভাবে পরিবর্তিত ও অর্ধেক হজমের অবস্থায় আনিয়া ফেলে। সেইজন্য দুধ অপেক্ষা দধি হজম করা সহজ। দধির ব্যবহার আমাদের দেশে প্রচলিত থাকিলেও অন্যান্য দেশে তত ছিল না। প্রায় পঞ্চাশবৎসর

পূর্বে খ্যাতনামা মেশনিকফ ইহার প্রতি বৈজ্ঞানিক জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে বুলগেরিয়াতে অনেকেই শত বৎসরের পরমায়ু লইয়া বাঁচিয়া আছে এবং তথাকার লোক সকলেই দধি খাইয়া থাকে। তিনি বলিলেন যে, মানুষের অন্ত্রের মধ্যে অনেক অনিষ্টকারী বীজাণুর বসবাস থাকে, উহারাই শরীরের বার্ধক্য আনিয়া দেয় এবং পরমায়ু ক্ষয় করে। দধির সহিত যে ল্যাকৃটিক অ্যাসিড বীজাণু থাকে সেগুলি পেটে গিয়া ঐ সকল অনিষ্টকারী বীজাণুকে খাইয়া ফেলে। সুতরাং প্রত্যহ যদি দধি খাওয়া অভ্যাস করা যায় তাহা হইলে আমাদের পরমায়ু বাড়িয়া যাইতে পারে। তাঁহার এই থিওরি হইতেই নানা দেশে নানাভাবে দধির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে এবং আমাদের দেশেও ডাক্তারের কথায় দধির আদর বাড়িয়া গিয়াছে। দধি যে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা মাংসাদি খাদ্যের পচন নিবারণ করে, বায়ুনাশ করে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। দধি মন্থন করিয়া ও জল মিশাইয়া ঘোল প্রস্তুত হয়, তাহা অতি উত্তম পানীয়।

দুধ জ্বাল দিয়া ঘন করিলে ক্ষীর হয়। অনেকে মনে করেন ইহা গুরুপাক দ্রব্য, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। পূর্বে বলা হইয়াছে দুধের জল মরিয়া গেলেই উহার কেসীন এমন পরিবর্তিত হইয়া যায় যে, পেটের ভিতর গিয়া উহা আর স্বাভাবিক দুধের কেসীনের মতো শক্ত শক্ত দলা বাঁধে না। সেইজন্যই দেখা যায় যে, যাহাদের পেটে বল্‌কা দুধ হজম হয় না, তাহারা অনেক সময় ঘন দুধ বা ক্ষীর বেশ হজম করিতে পারে।

ছানা হইতেই আমাদের দেশে নানারূপ মিষ্টান্ন পাক করা হয় এবং সেইজন্য এদেশে দুধের অপেক্ষা ছানার কাটতিই বেশি।

ছানা হইতে আর এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে ইংরেজিতে বলে চীজ। ইহা আমাদের দেশে তেমন ব্যবহার হয় না, কিন্তু য়ুরোপে

ইহার যথেষ্ট প্রচলন। ছানাতে কিছু নুন দিয়া উহা কিছুকাল যাবৎ ঝাঁক দিয়া রাখিলে উহা কঠিন হইয়া জমিয়া গিয়া চীজে পরিণত হয়। এই চীজের মধ্যে প্রোটিনের পরিমাণ যত বেশি এমন আর কোনো খাদ্যেই নাই। এক সের পাঁঠার মাংসে যতটা প্রোটিন পাওয়া যায়, আধ সের চীজে প্রায় ততটাই পাওয়া যায়। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য দেশে যাহারা নিরামিষ ভক্ষণের পক্ষপাতী তাহাদের কাছে চীজের বড়ো আদর। তাহারা ইহা রুটির সহিত খায় এবং ইহার দ্বারা নানারূপ তরকারিও প্রস্তুত করে।

জল এবং অন্যান্য পানীয়

জলের কথা আমরা ইতিপূর্বে একবার বলিয়াছি।

প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ রসায়নাগারে জলের ন্যায় দ্রাবক আর একটিও নাই। সংসারে অদ্রবণীয় বস্তুও যথেষ্ট আছে, কিন্তু তথাপি সাধারণ-পক্ষে অধিকাংশ কঠিন দ্রব্যকেই ইহা অতি সহজে গলাইয়া আপনার সহিত মিশাইয়া ফেলিতে পারে। জীবদেহ গড়িতে প্রকৃতির এমনি একটি চমৎকার সর্ববাহী তরল উপকরণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নতুবা দেহের মধ্যে প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম কোষে কোষে নানাপ্রকার খাদ্য-দ্রব্যাদি প্রবেশ করাইয়া দিবার সুবিধা হইবে কিরূপে। সেই মধ্যস্থতা করিবার জন্য আমাদের দেহের সর্বত্রই জলের ব্যবস্থা। দেহের প্রত্যেক অংশের প্রত্যেক কোষের ভিতরে ভিতরেও জল, আশে-পাশেও জল এবং যে রক্ত শিরা উপশিরার মধ্য দিয়া শরীরের সর্বত্রই বহমান, তাহাও প্রধানত জল। পৃথিবীর সম্বন্ধে যেমন আমরা জানি যে, উহার তিন-ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল, আমাদের শরীর সম্বন্ধেও প্রায় সেই একই

কথা, ইহার মধ্যে প্রায় তিন ভাগ জল ও একভাগ কঠিন পদার্থ। কেবল দ্রাবক বলিয়া নয়, আরো একটি বিশেষ গুণের জন্য শরীরের মধ্যে ইহার এমন প্রয়োজনীয়তা। সেই গুণটি এই যে, ইহা জৈবঝিল্লির আবরণ ভেদ করিয়া অনায়াসে সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারে ; সুতরাং শরীরের এক অংশ হইতে অন্য অংশের মধ্যে নানাপ্রকার পর্দার ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ইহা তাহার মধ্য দিয়া চুঁইয়া চুঁইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায় এবং এক স্থানের দ্রবণীয় পদার্থ অন্য স্থানে লইয়া গিয়া উভয়ের মধ্যে আদানপ্রদান ঘটায়। জলের এইরূপ ব্যবধানভেদী আদানপ্রদান করিবার প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলে অসমোসিস। নানাপ্রকার বাহিরের খাদ্য হজমশক্তির দ্বারা তরল হইয়া রক্তের মধ্যে চলিয়া যাইতেছে এবং তাহারই মধ্যস্থতায় উহা দেহস্থ প্রত্যেক কোষে কোষে গিয়া পৌঁছিতেছে। যখন শরীরের নিত্যক্রিয়ার ফলে সর্বত্র কোষগুলির মধ্যে নানারূপ আবর্জনা জমিয়া উঠিতেছে, তখন তাহা রক্তের মধ্যে ত্যাগ করিয়া দিয়া তৎপরিবর্তে কোষগুলি ঐ নূতন খাদ্যকে গ্রহণ করিয়া লইতেছে। রক্তস্রোতের জলীয় অংশ যখন এইরূপে মলিন হইয়া যাইতেছে তখন শরীরের পক্ষে উহা হানিকর, উহা তখন মূত্র, ঘর্ম, নিঃশ্বাসবাষ্প ও মলের সহিত শরীর হইতে নানাভাবে নির্গত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু জল কমিয়া গেলে তো শরীরের চলিবে না, উহার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, সর্বদা উহা সেই পরিমাণে বজায় থাকা চাই। অতএব বাহির হইতে নিত্যই নূতন জল সরবরাহ করা চাই। খাদ্য দিতে দুদিন বিলম্ব হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু জল যখনই বাহির হইয়া যাইবে তখনই পুনরায় ভরিয়া দিতে হইবে, নতুবা সমূহ বিপদ। মুখ দিয়া পান করা ছাড়া শরীরে জল ভরিবার অন্য উপায় নাই। চামড়ার লোমকূপ দিয়া ঘর্ম নির্গত হয় বটে, কিন্তু তাহা দিয়া

জল ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। জল যখন পান করা যাইতেছে না তখন চিকিৎসকেরা মলদ্বার দিয়া জল প্রয়োগ করেন, শিরা কাটিয়া ইন্‌জেকশন দিয়া জল একেবারে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন, কিন্তু তাহাতেও অনেক সময় যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ করা যায় না। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জল আমাদিগকে মুখ দিয়াই পান করিতে হইবে।

জল কেমন করিয়া হজম হয়, অর্থাৎ কেমন করিয়া উহা পেটের ভিতর হইতে শোষিত হইয়া শরীরের সর্বত্র প্রবেশ করে? পান করিলেই উহা প্রথমে পাকস্থলীতে যায়, কিন্তু তথা হইতে উহা অল্পই শোষিত হয়। পাকস্থলী ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই উহা ক্ষুদ্র অন্ত্রে গিয়া প্রবেশ করে এবং তথা হইতে অধিকাংশ শোষিত হইয়া পোর্টাল শিরা বা আন্ত্রিক শিরার মধ্যে চলিয়া যায়। ঐ শিরার রক্তের সহিত মিশিয়া উহা যকৃতে গিয়া প্রবেশ করে এবং যকৃতের অভ্যন্তরস্থান ধৌত করিয়া দিয়া অবশেষে সাধারণ রক্তের সহিত গিয়া মিশ্রিত হয়। রক্তে জলের পরিমাণ কখনো নির্দিষ্ট মাত্রার অধিক থাকিতে পারে না, অধিক হইলেই তাহা তৎক্ষণাৎ কিডনির চালুনি দিয়া ছাঁকিয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

দৈনিক কতটা করিয়া জল আমাদের পান করা উচিত? এ কথার উত্তর দিবার পূর্বে আমাদের দেখিতে হইবে প্রত্যহ কতটা করিয়া জল আমাদের শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, উহা দুই সের আড়াই সেরের কম নয়। তাহার মধ্যে সবটাই কেবল মূত্ররূপে বাহির হয় না। অধিকাংশ ঐরূপে নির্গত হইলেও কতকটা নির্গত হয় ঘর্মরূপে, কতকটা নিঃশ্বাসের সহিত বাষ্পরূপে, এবং কতকটা মলের তারল্যের সহিত। এই ক্ষতিকে পূরণ করিতে হইলে আমাদের অতটা পরিমাণেই জল গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য খাদ্যাদির সহিত অজানিতভাবে আমরা অনেক জল গ্রহণ করিয়া থাকি।

আমাদের অধিকাংশ খাদ্যই নরম, তাহার মধ্যে কিছু কিছু জল থাকেই। খাদ্য খাইতে খাইতেও আমরা দুই চারি চুমুক জল পান করিয়া লই। কিন্তু তবুও তাহা শরীরের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেইজন্য ক্ষুধা না থাকিলেও মধ্যে মধ্যে আমাদের তৃষ্ণা লাগে। তৃষ্ণার অর্থ আর কিছুই নয়, শরীরের মধ্যে জলের প্রয়োজন হইয়াছে তাহাই জানাইয়া দেওয়া। এই চাহিদা আমাদের মিটাইতেই হয়, না মিটাইয়া কোনো উপায় থাকে না। আমাদের দেশে গরমের সময় প্রচুর ঘাম বাহির হয়, সুতরাং সকলেই সে সময় কিছু বেশি জল খাইয়া থাকে। পরিশ্রম করিলেও লোকে বেশি জল খায়। কম জল খাওয়া অভ্যাস করা অপেক্ষা বেশি জল খাওয়া অভ্যাস করাই ভালো। জল কম করিয়া পান করিলে শরীরের নানারূপ অসুস্থতা আসে, কারণ যদিও তাহা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তথাপি শরীরের প্রয়োজন তাহাতে সিদ্ধ হয় না।

সকল দিক দিয়া হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আহারাদির সঙ্গে ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবেও আমাদের দেড় সের অর্থাৎ পাঁচ ছয় গ্লাস করিয়া জল দৈনিক পান করা উচিত। যাহাদের অন্যান্য নানারূপ পানীয় গ্রহণ করা অভ্যাস আছে তাহাদেরও স্বতন্ত্রভাবে অন্তত তিন গ্লাস করিয়া জল পান করা উচিত। তৃষ্ণা না পাইলেও ইহা অভ্যাস করিয়া লওয়া উচিত। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া এক গ্লাস, রাত্রে শয়নের পূর্বে এক গ্লাস এবং দ্বিপ্রহরে আহারের এক ঘণ্টা পূর্বে এক গ্লাস জল পান করিতে অনেকেই উপদেশ দিয়া থাকেন। এইরূপ সময়ে খালি পেটে জল পান করিলে হজমের যন্ত্রগুলি একবার করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যায় এবং হজমের কার্যে তাহাতে সাহায্য হয়। সাধারণের মধ্যে অনেকের ধারণা আছে যে, বেশি জল খাইলে শরীর মোটা হইয়া যায়। ইহা নিতান্ত ভুল ধারণা।

আহারের সময় জল পান না করিয়া উহা স্বতন্ত্রভাবেই পান করা উচিত। খাদ্যের সহিত জল পান করিলে হজমের অনেক অসুবিধা হয়। প্রথমত ঐরূপ অভ্যাস থাকিলে প্রত্যেক দুই চারি গ্রাস খাদ্য খাইবার অন্তরেই পুনঃপুনঃ জল পান করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাতে অর্ধচর্বিত অবস্থাতেই অনেক খাদ্য গলাধঃকৃত হইয়া পাকস্থলীতে চলিয়া যায় এবং ঐরূপ খাদ্য হজম করিতে অনেক বিলম্ব লাগে। দ্বিতীয়ত খাদ্যের সহিত মিশিয়া থাকে বলিয়া ঐ জল অনেকক্ষণ পর্যন্ত খাদ্যের সহিত পাকস্থলীতেই থাকিয়া যায়, খাদ্য অন্ত্রে না নামিয়া গেলে উহাও নামিতে পারে না এবং হজমও হইতে পারে না।

জলই আমাদের স্বাভাবিক পানীয়, উহা ব্যতীত অন্য কিছু পানীয় হিসাবে আমাদের ব্যবহার করিবার কথা নয়। কিন্তু মানুষ সর্বদাই কিছু ব্যতিক্রমের অভ্যাস করিয়া লইতে চায়। জলের যে গুণ আছে তাহার সহিত আরো কিছু অতিরিক্ত আস্বাদ পাইবার উদ্দেশ্যে মনুষ্য-সমাজে নানা প্রকার পানীয়ের প্রচলন হইয়া গিয়াছে। সভ্য এবং অসভ্য সকল প্রকার মানুষই জলের সহিত নানারূপ দ্রব্য মিশাইয়া কৃত্রিম পানীয় প্রস্তুত করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কোনোটি বা রসনার তৃপ্তি করে, কোনোটি শরীরে নূতন প্রকারের স্নিগ্ধতার অনুভূতি আনিয়া দেয়, কোনোটি ক্লান্তি অপনোদন করে, কোনোটি বা শরীর ও মনকে কিছু চাঙ্গা করিয়া দেয়। মানুষের মধ্যে এই এক দুর্বলতা আছে, খাদ্য এবং জল ব্যতীত আরো কিছু পান-বিলাসিতা তাহার প্রয়োজন, নতুবা যেন তাহার তৃপ্তি হয় না। এই প্রয়োজন-বোধ হইতেই নানারূপ নির্দোষ পানীয়েরও সৃষ্টি হইয়াছে এবং বিভিন্নরূপ মাদক জাতীয় পানীয়েরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রয়োজনবোধ মানুষের মনে এত অধিক যে বরং দুই-এক দিন খাদ্য না পাইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু যে

পানীয়টি যাহার প্রিয় উহা একদিন না পাইলে তাহার দারুণ অস্বস্তি ঘটে।

কৃত্রিম পানীয়ের কথা বলিবার পূর্বে আরো একটি স্বাভাবিক পানীয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। উহা ডাবের জল। ডাবের জলে অনেক উপকারিতা আছে। ফলকোষের মধ্যে সযত্ননিবদ্ধ এই স্বভাবজ বারিতে কিছু শর্করা আছে, সামান্য মাত্রায় কিছু প্রোটিন আছে এবং কিছু লবণাদি আছে। ইহা সুস্বাদু, তৃষ্ণা নিবারক এবং অম্লদোষ নাশক। এই সকল গুণ তো আছেই, কিন্তু ইহার সর্বপ্রধান উপকারিতা এই যে, ইহার মধ্যে কোনো অপকারিতা নাই। জল নানারূপভাবে দূষিত হইতে পারে এবং নানা প্রকার রোগের বীজাণু উহার মধ্যে থাকিতে পারে। কিন্তু ডাবের জল সর্বদাই বিশুদ্ধ এবং সর্বদাই নিরাপদ, যতক্ষণ পর্যন্ত ডাবটি কাটা না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহার ভিতরকার জল দূষিত হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা নাই।

কৃত্রিম সরবৎ আমাদের দেশে নানা রকম করিয়া প্রস্তুত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের পক্ষে পানীয় লইয়া এটুকু বিলাস-বাহুল্য করা খুবই স্বাভাবিক। সম্ভবত মুসলমানী যুগ হইতেই আমাদের দেশে সরবৎ ব্যবহারের বহুল প্রচলন ঘটিয়াছে।

সরবৎ আছে নানারূপ। মিছরির সরবৎ, চিনির-পানা, গুড়ের সরবৎ, বাতাসার সরবৎ— এ সকল তো আছেই। তদ্ভিন্ন উপরন্তু লেবু, তেঁতুল, ঘোল, বেল, আনারস, তরমুজ, আমপোড়া প্রভৃতি নানারূপ দ্রব্য মিশাইয়া উহাকে আরো মুখরোচক করিয়া তোলা হয়। এই সকল সরবৎ পান করা উত্তম; উহাতে সাধারণত কোনো দোষ নাই।

সরবৎ ব্যতীত বর্তমান যুগে এইরেটেড ওয়াটার বা বোতলের জল পান করার বহু প্রচলন ঘটিয়াছে। এই সকল জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড

বাষ্প মিশ্রিত থাকে, বোতল খুলিলেই উহার বুদ্‌বুদ উঠিতে থাকে। উহা পাকস্থলীকে কিছু স্নিগ্ধ করে এবং হজমের পক্ষে কিছু সহায়তা করে। যাঁহারা দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান তাঁহাদের পক্ষে পাঁচ ঘাটের জল পান করা অপেক্ষা এইরূপ বোতলের জল পান করাই শ্রেয়। তবে বোতলের জল হইলেই যে তাহা নিরাপদ হইল এমন নয়। যেখানে এই সকল জল অত্যন্ত সাবধানতার সহিত প্রস্তুত করা হয় এবং যেখানে বিশুদ্ধ জল ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার দূষিত জল ব্যবহৃত হইতে পারে না বলিয়া জানা আছে, এমন কতকগুলি নামজাদা কারখানার জল ব্যতীত অন্য কোথাকার জল ব্যবহার করা নিরাপদ নয়।

অতঃপর আসিয়া পড়ে চায়ের কথা। এখনকার দিনে ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত পানীয়। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই ইহার প্রচলন। এই সর্বজনপ্রিয় চায়ের কথা পূর্বকালে কেহই জানিত না, কেবল চীনদেশেই বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহার ব্যবহার ছিল। ইহা ইংলণ্ডে প্রথম আনীত ও ব্যবহৃত হয় মাত্র চারিশত বৎসর পূর্বে। অতি শীঘ্রই ইহা জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং দেশে দেশে ইহার ব্যবহার শুরু হইয়া যায়। আমাদের দেশে ইহা সম্প্রতি ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখনো একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

চায়ের মধ্যে নানারূপ রাসায়নিক উপাদান আছে, তন্মধ্যে তিনটি পদার্থই প্রধান। উহার মধ্যে একটি শরীরের পক্ষে উপকারক, একটি হানিকারক এবং একটি চায়ের বিশিষ্ট সুগন্ধিকারক। প্রথমটির নাম কেফীন, উহা সাময়িক উত্তেজক, ক্লান্তিনাশক, ও মূত্র বৃদ্ধিকারক এক-প্রকার উপক্ষার। দ্বিতীয়টি ট্যানিক অ্যাসিড, উহা কষায়গুণযুক্ত এক প্রকার ধারক। তৃতীয়টি একপ্রকার উদ্‌বায়ী তৈল।

চায়ের উপকারিতা আছে সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের দেশের

গরিব লোকেরাও আজকাল ব্যবহার করিয়া থাকে। সস্তায় এমন শ্রান্তিলাঘবকারী পানীয় আর দ্বিতীয় নাই। ইহা স্নায়ুমণ্ডলীকে সঞ্জীবিত করে, ক্লান্তি দূর করে, মানসিক স্ফূর্তি আনে, খাটিবার শক্তি বাড়াইয়া দেয় এবং প্রচুর ঘাম নির্গত করিয়া দিয়া শরীরকে স্নিগ্ধ করে। মাথা ধরিলে বা শরীর অসুস্থ বোধ করিলে এক পেয়ালা চা পান করিয়া অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল উপকার পাওয়া যায় কেবল উহার পরিমিত ব্যবহারে। মাত্রার আধিক্য হইলেই গুণের বদলে উহার অগুণ ঘটিতে থাকে।

অত্যধিক চা-পায়ীদের হাত কাঁপে, দম থাকে না, হার্টের দুর্বলতা দেখা দেয় এবং স্নায়ুদোষ, মাথাঘোরা, কান ভোঁ ভোঁ করা, অনিদ্রা, মানসিক অবসাদ, অজীর্ণ ও অক্ষুধা, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি নানারূপ অসুস্থতা দেখা দিতে থাকে,—অথচ চায়ের দ্বারাই এই সকল অনিষ্ট হইতেছে জানিয়াও তাহারা চা ছাড়িতে পারে না।

চায়ের বদলে অনেকে কফি খান। কিন্তু সে একই কথা। চায়ের মধ্যে যাহা থাকে, কফির মধ্যেও তাই। ইহাতে কেফীনও আছে, ট্যানিন ও আছে এবং এক প্রকার সুগন্ধি উদ্‌বায়ী তৈলও আছে, উহার গন্ধটি পৃথক। এই সুগন্ধি দ্রব্যের নাম কেফীওন, ইহা শরীর ও মনের উত্তেজক। অধিকন্তু ইহা মৃদু বিরেচক, সেইজন্য কফিতে চায়ের মতো কোষ্ঠকাঠিন্য আনে না। পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা এবং অধ্যবসায়ী সাহিত্যিকেরা অনেকে রাত্রি জাগরণ করিবার জন্য কফি পান করিয়া থাকেন। সাময়িক ব্যবহারে অবশ্য কোনো দোষ নাই, কিন্তু নিয়মিত এইরূপ রাত্রি জাগরণ করিতে থাকিলেই স্নায়ুসকলের অবনতি ঘটে। কফিও একপ্রকার নেশার বস্তু, অধিক ব্যবহারে চায়ের মতোই অনিষ্টকারী। কিন্তু আফিম প্রভৃতি কয়েকপ্রকার বিষের দোষ কাটাইবার পক্ষে বিশেষ উপকারী।

অনেকে কোকো খান। ইহা একপ্রকার ফলের বীজ হইতে প্রস্তুত। বিলাতে চায়ের প্রচলনের শতাধিক বৎসর পূর্বে ইহার প্রচলন হইয়াছিল। ইহা হইতেই চকোলেট প্রস্তুত হয়। চা ও কফি হইতে ইহা অনেক ভালো, কারণ ইহাতে ট্যানিক অ্যাসিড নাই, উপরন্তু ইহার মধ্যে স্নেহপদার্থ, প্রোটিন এবং স্টার্চ থাকাতে ইহার যথেষ্ট খাদ্যগুণ আছে; সুতরাং পানীয় হিসাবে খাইলেও ইহা শরীরে কিছু শক্তি উৎপাদন করে। ইহাতে থিওব্রোমিন নামে একপ্রকার উত্তেজক বস্তু আছে, উহার ক্রিয়া কেফীনের সমান হইলেও মাত্রায় তাহা অনেক কম।

অনেকে চা কফি কিংবা কোকো কিছুই না খাইয়া কয়েক প্রকার কৃত্রিম পেটেণ্ট দ্রব্য পানীয়ার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহার অধিকাংশই যব কিংবা গম ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া কফি কিংবা কোকোর নকলে প্রস্তুত। বহু বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও এইগুলি চায়ের সমান জনপ্রিয় হইতে পারিল না।

সুরা পানের কথা এখানে না বলিলে আমাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ হইবে না। অন্যান্য দেশে ইহার বহুল প্রচলন থাকিলেও আমাদের দেশে ইহা লুকাইয়া চুরাইয়াই ব্যবহৃত হয়। এই গরিব দেশে ইহা নিত্য নিয়মিত পান করিবার সামর্থ্য খুব কম লোকেরই আছে। অন্যান্য দেশের মতো ইহা প্রকাশ্যভাবে পান করা আমাদের সমাজে প্রচলিত হয় নাই। মূর্খ লোকেরা কখনো কখনো তাড়ি পান করে কিন্তু তাহা ধর্তব্য নয়। আমাদের দেশে সকলেই জানে যে, মদ্যপানে সামজিক বাধা আছে এবং শরীরের পক্ষেও ইহা হানিকর। যদিও প্রচুর জল বা সোডা প্রভৃতি মিশাইয়াই ইহা ব্যবহৃত হয়, তথাপি নেশার দ্রব্য ব্যতীত ইহাকে পানীয় বলা যাইতে পারে না। অন্যান্য পানীয়ের মতো ইহা অন্ত্রে গিয়া প্রবেশ করিবার পূর্বেই পাকস্থলী হইতে শোষিত হইয়া দুই

মিনিটের মধ্যে একেবারে রক্তে প্রবেশ করে এবং পনেরো মিনিটের মধ্যেই ইহার সম্পূর্ণ ক্রিয়া ঘটে। ইহা যে উত্তেজনা আনে তাহা অনেকটা প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার ফল। মদ্য গলাধঃকরণ না করিয়া কেবল মুখে লইয়া, কুলকুচা করিয়া ফেলিয়া দিলেও ঐ উত্তেজনাটুকু পাওয়া যায় ইহা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ইহার কুফল যথেষ্ট। লিভারে অধিক রক্ত সঞ্চার করিয়া ইহা লিভারকে একেবারে জখম করিয়া দেয়। রক্তকে নষ্ট করিয়া রক্তের প্রতিরোধশক্তি অসাড় করিয়া দেয় এবং মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম বুদ্ধির গুণগুলি জন্মের মতো নষ্ট করে। ইহার যেটুকু উপকার সেটুকু একগ্লাস মিছরির সরবৎ পান করিলে পাওয়া যায়।

খাদ্যবিচার

আহারের পরিমাণ

যেহেতু শরীরের একটা নির্দিষ্ট ওজন আছে, সেই হেতু উহার আহার্য সম্বন্ধেও একটা ওজনের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার যেমন শরীর, তাহাকে তদনুযায়ী মাত্রায় খোরাক গ্রহণ করিতে হইবে। উহার কম খাইলেও দোষ, আবার বেশি খাইলেও দোষ।

খাদ্যের পরিমাণ কাহার পক্ষে কতটা হওয়া উচিত, তাহা বলিয়া দেওয়া কঠিন। তবে এ বিষয়ে বিজ্ঞান গড়পড়তা হিসাবে একটা মাত্রা নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। খাদ্য আমাদের ইন্ধনস্বরূপ, উহা অক্সিজেন কর্তৃক দাহ হইয়া শক্তি বা এনার্জি জন্মায়। সেই শক্তি উত্তাপরূপে অথবা কর্মরূপে প্রকাশ পায়। কর্মের পরিমাণ মাপা যায় না, কিন্তু তাপের পরিমাণ মাপা যায়। অতএব যে খাদ্য যতটা তাপ

উৎপাদন করিতে পারিবে, তাহার খাদ্যমূল্য বা ক্যালোরিমূল্য ততটা হইবে। কোন্ খাদ্য অক্সিজেন সহযোগে কতটা তাপ উৎপাদন করিতে পারে, ইহা মাপিয়া দেখিবার একরূপ যন্ত্র আছে, সুতরাং শরীরের মধ্যে গিয়া উহা কতটা তাপ জন্মায়, তাহা ঐ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার দ্বারা বাহির হইতেই জানা যায়। ঐ যন্ত্রের নাম ক্যালোরি-মিটার। খাদ্যের এই প্রকার তাপ-মূল্যের নাম ক্যালোরি। ওজন অনুসারে কোন্ কোন্ খাদ্যের গড়পড়তা ক্যালোরিমূল্য কত, তাহা এখন আমরা সকলেই জানি,— যথা—১ গ্র্যাম (১৫½ গ্রেণ) প্রোটিন হইতে পাওয়া যায় ৪·১ ক্যালোরি, ১ গ্র্যাম কার্বোহাইড্রেট হইতে পাওয়া যায় ৪·১ ক্যালোরি অর্থাৎ ঐ একই মাত্রার উত্তাপ বা কর্মশক্তি ; এবং এক গ্র্যাম চর্বিজাতীয় খাদ্য হইতে পাওয়া যায় ৯·৩ ক্যালোরি, অর্থাৎ উপরোক্ত দুই প্রকার খাদ্যের দ্বিগুণ।

এক সের জলের উত্তাপ এক ডিগ্রি বাড়াইতে হইলে যতটা অগ্নি-তাপের প্রয়োজন, তাহাই এক ক্যালোরি। এই অনুপাতেই ক্যালোরি-মিটার যন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যবস্তুর ক্যালোরিমূল্য মাপা যায়। আবার এক প্রকার সুবৃহৎ ক্যালোরি-মিটার যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক পরিশ্রমে কত ক্যালোরি এনার্জি খরচ হইতেছে তাহাও মাপিতে পারা যায়। এইরূপে মাপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মানুষকে যদি সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় একেবারে শয্যাগত করিয়া রাখা হয়, তথাপি তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-চলাচল, তাপ-সংরক্ষণ প্রভৃতি শরীররক্ষার ক্রিয়াগুলির জন্য প্রত্যহ ২০০০ ক্যালোরি শরীর হইতে ব্যয় হয়,—কিন্তু সামান্য পরিশ্রম করিলেই তাহার ব্যয় হইতে থাকে— ৩০০০ ক্যালোরি, সাধারণ পরিশ্রমে— ৩৫০০ ক্যালোরি, এবং কঠিন পরিশ্রমে ৪০০০ ক্যালোরি। এই হিসাব অনুসারে ধরিয়া লইতে হইবে যে,

আমাদের সাধারণ পরিশ্রমের অবস্থায় দৈনিক ৩০০০ হইতে ৩৫০০ ক্যালোরি মূল্যের খাদ্য প্রয়োজন, তাহার অধিক নয়। ইহা অবশ্য তিন প্রকার খাদ্যের মধ্যে বাঁটোয়ারা করিয়া লইতে হইবে এবং যে খাদ্য যাহার পক্ষে অধিক প্রয়োজন, তাহাকে উহার অধিক অংশ দিতে হইবে। দেখা গিয়াছে যে, সাধারণপক্ষে ইহার জন্য অন্যূন ১০০ গ্রাম বা আন্দাজ দুই ছটাক প্রোটিন, ঘৃতাদি খাদ্য ১০০ গ্রাম বা আন্দাজ দুই ছটাক, এবং কার্বোহাইড্রেট ৫০০ গ্রাম বা আন্দাজ অর্ধসের দৈনিক খাওয়া দরকার।

আমরা যে মাত্রাগুলির উল্লেখ করিলাম, তাহা একটা মোটামুটি ধারণা জন্মাইবার জন্য। স্থান, কাল এবং পাত্র অনুসারে যে ইহার বহু অদল-বদল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শীতপ্রধান দেশের লোকে শীতের সময় খাইবে বেশি, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকে গরমের সময় খাইবে কম। শারীরিক পরিশ্রমী লোক খাইবে বেশি, মানসিক পরিশ্রমী লোকে খাইবে কম। বিভিন্ন বয়সে খাদ্যের প্রকারের ও মাত্রারও বিভিন্নতা হইবে। বাল্যকাল হইতে কিশোর বয়স পর্যন্ত খাদ্যের মাত্রা বাড়িয়াই চলে, কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে হঠাৎ কিছু কালের জন্য ক্যালোরির প্রয়োজন কমিয়া গিয়া খাদ্যের মাত্রা অত্যন্ত কমিয়া যায়। তাহার পর যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন একবার কিছু অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া যায় এবং কিছুকাল পরে উহা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। শরীরের গঠন সম্পূর্ণ হইয়া গেলে, তখন খাদ্যের পরিমাণ একইভাবে থাকিয়া যায়। মধ্য বয়স হইতে আবার খাদ্যের পরিমাণ কমিতে থাকে। তখন শরীরে নূতন করিয়া গড়িবার কিছু নাই, শারীরিক পরিশ্রমও কম, হজমশক্তিও কম। তদনুসারে চল্লিশ বৎসরের পর হইতেই খাদ্যের মাত্রা কমাইতে শুরু করিতে হয়।

স্ত্রীলোকদিগের খাদ্য পুরুষদিগের অপেক্ষা স্বভাবতই কিছু কম, কারণ পুরুষদের অপেক্ষা উহাদের পরিশ্রম কম। কিন্তু একথা সকল সময়ে খাটে না। সন্তানসম্ভবা হইলে উহাদের খাদ্যের মাত্রা বাড়িয়া যায়, কারণ তখন একজনের খাদ্যে দুইটি প্রাণী জীবনধারণ করিতেছে।

এ ছাড়া যাহারা শহরের বদ্ধবায়ুতে বাস করে এবং যাহাদের পরিশ্রমটা শুধু অফিসে বসিয়া কেরানীগিরি করা, তাহাদের ক্যালোরির প্রয়োজন স্বভাবতই অনেক কম হইবে; যাহারা মুক্ত বায়ুতে থাকে, মুক্ত বায়ুতে শোয় এবং মুক্ত মাঠে মাঠে চাষ করিয়া অথবা অন্যপ্রকারে ঘোরাঘুরি করিয়া বেড়ায়, তাহাদের প্রয়োজন স্বভাবতই অধিক হইবে।

বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন ওজনের ও তাহাদের খাটিবার ও খাইবার শক্তি বিভিন্ন প্রকার হইলেও উহার একটা মোটামুটি সীমা আছে। মানুষ মাত্রেই নিজ নিজ গঠন ও অবস্থার অল্পবিস্তর পার্থক্য লইয়া ঐ সীমারই মধ্যে আবদ্ধ। সাধারণ বয়স্থ মানুষের শরীরের ওজন সওয়া মন হইতে সওয়া দুই মন পর্যন্ত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাঙালির গড়পড়তা ওজন এক মন পনেরো সের। সাধারণ সুস্থ মানুষের দৈনিক পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা কতটা সীমার মধ্যে তাহাও একরূপ নির্দেশ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অতএব সাধারণ সুস্থ বাঙালিকে কতটা খাদ্য দেওয়া উচিত, ইহারও একটা মোটামুটি মাপ দেওয়া যায়।

আমরা দেখিয়াছি সাধারণত আমাদের ৩০০০ ক্যালোরির দ্রব্য দৈনিক খাওয়া প্রয়োজন। মোটামুটি উহা যদি এইরূপে ভাগ করিয়া লওয়া যায় :—

কার্বোহাইড্রেট খাদ্য হইতে— ১,৮০০ ক্যালোরি, প্রোটিন খাদ্য হইতে— ৪০০ ক্যালোরি, চবিজাতীয় খাদ্য হইতে— ৮০০ ক্যালোরি, তাহা হইলে আমরা মোট ৩,০০০ ক্যালোরি পাইলাম।

অতঃপর এই ক্যালোরিকে আমাদের নিজেদের চলতি ওজনে রূপান্তরিত করিয়া লইতে হইবে, নতুবা আমাদের বক্তব্য কিছুমাত্র পরিস্ফুট হইবে না। কোন্ জাতীয় কতটা খাদ্য হইতে কত ক্যালোরি পাওয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এক ছটাক কার্বোহাইড্রেটের উত্তাপমূল্য ২৩২ ক্যালোরি। এক ছটাক প্রোটিনের উত্তাপমূল্যও উহারই সমান, অর্থাৎ ২৩২ ক্যালোরি। কিন্তু চবিজাতীয় খাদ্যের উত্তাপমূল্য ঐগুলির দ্বিগুণেরও অধিক, এক ছটাক ঘি কিংবা তেল কিংবা চর্বির উত্তাপমূল্য ৫২৮ ক্যালোরি। অতএব উপরিউক্ত ৩,০০০ ক্যালোরি লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রত্যহ নিম্নলিখিত পরিমাণে খাদ্য প্রয়োজন :—

কার্বোহাইড্রেট ৮ ছটাক (আধ সের)
= ১,৮৫৬ ক্যালোরি
প্রোটিন ২ ছটাক = ৪৬৪ ক্যালোরি
চর্বি খাদ্য ১½ ছটাক = ৭৯২ ক্যালোরি

মোট ৩,১১২ ক্যালোরি

এতদ্‌ব্যতীত অন্যান্য গুণযুক্ত খাদ্যেরও প্রয়োজন আছে এবং তাহারও পরিমাণ বলিতে পারা যায়। যথা, আমাদের দৈনিক ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন প্রায় ১ গ্রাম (১৫ গ্রেণ), ফসফরাসের প্রয়োজন প্রায় ১½ গ্রাম, লৌহের প্রয়োজন প্রায় ১৫ মিলিগ্রাম।

ভিটামিনগুলিরও প্রত্যেকটির দৈনিক প্রয়োজন কিছু কিছু আছে। মোটের উপর এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি তিন প্রকার প্রধান খাদ্য উপরিউক্ত পরিমাণে খাওয়া ব্যতীত যে সকল খাদ্যে ক্যালসিয়াম প্রভৃতি ধাতব লবণাদি আছে এবং যে সকল খাদ্যে ভিটামিনসমূহ আছে তাহাও কিছু কিছু পরিমাণে খাওয়া প্রয়োজন,

তবেই আমাদের খাদ্যতালিকা সকল দিক দিয়া সম্পূর্ণ হইবে এবং শরীরের যথাযথ পুষ্টি হইবে।

বলা বাহুল্য, আমরা অন্যূন ৩,০০০ ক্যালোরি মূল্যের যে খাদ্যতালিকা নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছি, তাহা পরিশ্রমী লোকের জন্য। য়ুরোপে যাহাদের তেমন শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না, লীগ অফ নেশনসের নির্দেশ অনুসারে তাহাদের ২,৪০০ ক্যালোরির বেশি খাওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমাদের দেশের নিষ্কর্মা লোকের পক্ষে উহা অপেক্ষা বরং আরো কম করিয়াই খাওয়া চলিতে পারে।

হিসাব করিলে দেখা যায় যে, আদর্শ খাদ্য সংগ্রহ করিতে প্রতি ব্যক্তির জন্য দৈনিক দশ পয়সার কিছু অধিক ব্যয় হয়।* এই খরচে অবশ্য দুধ, ঘি, মাংস, ডিম প্রভৃতি কিনিয়া খাওয়া যায় না, কিন্তু তথাপি শারীরিক প্রয়োজন যথাসাধ্য মিটাইয়া লওয়া যায়। এই খরচে আমরা প্রত্যহ মোট আধ সের ওজনে চাল এবং আটা, দুই ছটাক ছোলা এবং অন্যপ্রকার ডাল, এক ছটাক মাছ, এক ছটাক তেল, কিছু তরকারি, গুড়, নুন এবং জ্বালানি কয়লাও পাইতে পারি। ইহাতে প্রায় ৩০০০ ক্যালোরি মূল্যের খাদ্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে, এবং দুধ বা মাংস না পাইলেও প্রয়োজনীয় প্রোটিনের অভাব মিটিয়া যাইতে পারে। আমরা অবশ্য শহরের অধিবাসী সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছি, যেখানে প্রত্যেকটি দ্রব্য অর্থ দিয়া ক্রয় করিতে হয়। কিন্তু পল্লীবাসীর পক্ষে বুদ্ধিপূর্বক চেষ্টা করিলে ইহা অপেক্ষা আরও অনেক কম খরচে ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট দ্রব্য মিলিতে পারে।

প্রথমত চালের কথা। চাল মোটা হইলেও কোনো ক্ষতি নাই, যদি উহা ঢেঁকিছাঁটা হয়। অভ্যাস করিলেই উহা খাওয়া যাইতে পারে

* ইহা যুদ্ধের পূর্ববর্তী বাজারদর হিসাবে উক্ত হইয়াছে।

এবং উহা মিহি চালের সমান পুষ্টিকারক। পূর্বে বলা হইয়াছে, চাল যতই উত্তমরূপে পরিষ্কার করা যায় এবং উত্তমরূপে ধুইয়া লওয়া যায় ততই উহার ফস্‌ফরাস্‌ ও ভিটামিন প্রভৃতি সম্পদ কমিয়া যায়।

ডাল অতি উপাদেয় খাদ্য এবং দামেও সস্তা। ইহাতে যথেষ্ট প্রোটিন থাকে। মাছ মাংসাদির অভাব ডালেই কতক মিটিতে পারে। কাঁচা ছোলাও অতি উপকারী বস্তু। সকলেই উহা প্রাতঃকালীন খাদ্য হিসাবে ভিজাইয়া গুড় দিয়া খাইতে পারে। কেবল গরিবের পক্ষে নয়, সচ্ছল অবস্থার ব্যক্তির পক্ষেও ইহা উৎকৃষ্ট খাদ্য। ছোলা ভিজাইয়া যদি উহার কল বাহির করিয়া খাওয়া যায়, তবে চা-বিস্কুট অপেক্ষাও ইহা অনেক অধিক উপকারী। গরিব বলিয়া যাহারা মাংস, দুধ বা ডিম খাইতে পারে না তাহাদের পক্ষে জৈব-খাদ্য হিসাবে কিছু মাছ খাওয়া প্রয়োজন, কারণ ইহাতে যেরূপ সম্পূর্ণ প্রোটিন পাওয়া যায়, ডাল প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্যে তাহা পাওয়া যায় না। কিছু মাছ এবং ডাল খাইলে জৈব এবং নিরামিষ প্রোটিনে মিলিয়া আমাদের দৈনিক প্রোটিনের অভাব অনেকটা পূরণ হইয়া যায়। ইহার উপর প্রত্যহ না হউক, অন্তত সপ্তাহে একদিন করিয়াও যদি দুই ছটাক পরিমাণ মাংস খাওয়া যায় তাহাতে আরো উত্তম হয়। দুই ছটাক মাংসের দাম চারপয়সার বেশি নয়।

ভাতের সঙ্গে শাক-সবজি সকলেরই অধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত। পালং, পুঁই, হিঞ্চা, কলমি, গিমা, নটে, লালশাক, সজিনাডাঁটা, লাউ-কুমড়ার ডাঁটা প্রভৃতিতে ধাতব লবণাদি ও ভিটামিন প্রভৃতি থাকায় ঐগুলি অতি আবশ্যকীয় খাদ্য। তরকারি আমাদের দেশের লোকে বড়ো কম খায়। ইহার পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া উচিত, এবং প্রত্যহ অন্তত এক পোয়া করিয়া তরকারি খাওয়া উচিত।

সাধারণের পক্ষে নমুনাস্বরূপ একটি খাদ্যতালিকা এস্থলে দেওয়া

হইতেছে। সকলে না হউক, অধিকাংশ লোকই চেষ্টা করিলে এইরূপ খাদ্য অনায়াসে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। ইহাতে অধিক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না।

সকালে— ছোলা ভিজানো এক ছটাক এবং গুড়। সম্ভব হইলে এই সময় এক পোয়া দুধ।

দ্বিপ্রহরে— এক পোয়া চালের ভাত, ডাল— ২ ছটাক, তরকারি ২ ছটাক, মাছ অথবা মাংস—২ ছটাক।

বৈকালে— মুড়ি অথবা চিঁড়া অথবা ছাতু— ২ ছটাক, কিছু ফল ও গুড়।

রাত্রে— আটার রুটি— ১ পোয়া, ডাল— ২ ছটাক, তরকারি—২ ছটাক।

যদি নিয়মিত এইরূপ খাদ্য খাওয়া যায় তবে সাধারণ পরিশ্রমী লোকের পক্ষে ইহাতেই উত্তমরূপে স্বাস্থ্য বজায় থাকে।

আহারের নিয়ম

আমরা পৃথিবীতে যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন প্রকৃতির নিয়মগুলি মানিয়া চলিলেই সুস্থ থাকিব, আর অনিয়ম করিলেই অসুস্থ হইব। কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে সেই পালনীয় নিয়মগুলি আমরা সকলে জানি না। এইখানে বিজ্ঞান আমাদের সাহায্য করিতে পারে, নির্ভুল নিয়মাবলী দ্বারা আমাদের নিরাপদ পথ নির্দেশ করিয়া দিতে পারে। আমরা সেই বিজ্ঞাননির্দিষ্ট নিয়মগুলি এখানে মোটামুটিভাবে আলোচনা করিতেছি।

(১) খাদ্য মাত্রই সুস্বাদু করিয়া খাইতে হইবে। বিজ্ঞানের ইহাই সর্বপ্রথম উপদেশ। কেবল রসনার তৃপ্তির জন্য একথা নয়, হজমের সুবিধার জন্যও ইহার প্রয়োজন। রুচিকর খাদ্য খাইলে তবেই অন্ত্রস্থ পাচকরসগুলি সহজে নিঃসৃত হইয়া ক্রিয়া করিতে পারিবে।

(২) খাদ্য প্রয়োজনমতে, উচিত পরিমাণে, এবং পাঁচমিশালি করিয়া খাওয়া চাই। কোনোক্রমে পেটভরা যাহা হউক খাইলেই হইল না। দেখিতে হইবে যে, সকল প্রকারের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি খাওয়া হইতেছে কি না, এবং সর্বসমেত উহা আমাদের দৈনিক শারীরিক চাহিদার পক্ষে যথাযথ হইতেছে কি না। আমাদের খাদ্যের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট থাকা চাই,— প্রোটিন থাকা চাই,— তেল, ঘি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় দ্রব্য কিছু থাকা চাই— ভিটামিনযুক্ত টাট্‌কা খাদ্য হিসাবে শাক-সবজি এবং সম্ভব হইলে কিছু দুধ থাকা চাই,— আর কয়েকপ্রকার লবণও উহার মধ্যে থাকা চাই। ইহার কোনোটিকে বাদ দেওয়া চলিবে না, অথবা যে খাদ্য যতটা পরিমাণে আবশ্যক তাহা অত্যন্ত কমাইয়া দিলেও চলিবে না।

(৩) খাদ্য কিছু রকমারি করিয়া খাওয়া অভ্যাস করা উচিত। এ কথার অর্থ এমন নয় যে, অনভ্যস্ত খাদ্য খাওয়া অভ্যাস করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, আমাদের যাহা খাওয়া অভ্যাস আছে, তাহাই বারে বারে ওলট-পালট করিয়া খাইলে ভালো হয়। তাহার কারণ খাদ্যের নূতন নূতন আস্বাদ পাইলে হজমশক্তি সঞ্জীবিত হয়।

সকল প্রকার খাদ্যই আমরা অযথারূপে মিশাইয়া লই, কাহার সহিত কোন্‌টি মিশিবে, অথবা মিশিবে না, ইহার বিচার করি না। এ সম্বন্ধে কিছু বিচার আমাদের থাকা উচিত। মাংসাদি প্রোটিন খাদ্য যখন খাইতেছি তখন উহার সহিত ভাত বা রুটি প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট খাদ্য পরিমাণে কম করিয়া খাওয়া উচিত, কারণ দুইই সমান সমান খাইলে হজমের বিঘ্ন হয়। দুই প্রকার খাদ্যকে হজম করিতে দুই স্বতন্ত্র প্রকার পাচক রসের আবশ্যক, তাহা একত্রে সমান ভাবে কাজ করিতে পারে না। এই কারণে মাংসাদির সহিত মিষ্টান্নদ্রব্যও অধিক খাওয়া উচিত

নয়। মাছ-মাংসের সহিত অম্ল খাওয়া উত্তম, তাহাতে উহা হজমের সহায়তা করে, কিন্তু ভাত, মিষ্ট প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেটের সহিত অম্ল খাওয়া ঠিক নয় এবং অম্লরসাত্মক ফলাদি খাওয়া উচিত নয়, তাহাতে ক্ষারগুণযুক্ত পাচকরসের ক্রিয়া ব্যাহত হয়। চায়ের সহিত চপ, কাটলেট প্রভৃতি মাংস-প্রযুক্ত খাদ্য খাওয়া অনিষ্টকারী, ইহাতে হজমের বৈগুণ্য ঘটে। এই সকল বিষয়ে হিসাব করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের খাদ্য খাইবার ব্যবস্থা করিলে তাহাতে খাদ্যেরও বৈচিত্র্য হইতে পারে এবং স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়।

(৪) খাদ্য প্রত্যেকবার ঠিক ধার্য সময়েই খাওয়া উচিত। অনিয়ম করিয়া খাইলে অনিষ্ট হয় একথা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু অন্যান্য দেশের লোকে যেরূপ নিষ্ঠার সহিত এ বিষয়ে নিয়ম পালন করিয়া চলে, আমরা তাহা করি না। নিয়মে খাওয়ার অনেক গুণ। আমাদের শরীরের এবং মনের অভ্যাসবশে কাজ করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। যদি আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ার অভ্যাস করি, তবে প্রত্যহ ঠিক ঐ সময়টি উপস্থিত হইলে আপনি আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক হইবে এবং তখন যাহা খাওয়া যাইবে, তাহা অতি সহজে হজম হইয়া যাইবে।

(৫) প্রত্যহ কয়বার করিয়া খাওয়া উচিত? বিভিন্ন দেশে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন নিয়ম, আর বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন অভিমত। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, বয়ঃপ্রাপ্ত সহজ মানুষের পক্ষে দৈনিক একবার করিয়া খাইলেও চলিতে পারে। কিন্তু সমস্ত দিনের উপযোগী রসদ একবারে লইতে হইলে একসঙ্গে অনেকটা খাইতে হয়, আমাদের হজম-যন্ত্রগুলি সেভাবে গঠিত নয়, একসঙ্গে অনেকটা খাদ্য পাকস্থলীর পক্ষে গুরুভার হইয়া পড়ে এবং উহার মাংসগাত্র শিথিল হইয়া পড়ে।

কেহ কেহ বলেন কিছু কিছু করিয়া প্রত্যহ অনেকবার খাওয়া উচিত। কিন্তু তাহাতে খাওয়া লইয়াই অনেকটা সময় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। আসলে দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে বিভিন্ন সমাজের পক্ষে অবস্থা বুঝিয়া ইহার একটা রীতি করিয়া লইতে হয়।

(৬) খাদ্যের প্রত্যেক গ্রাসটি উত্তমরূপে চিবাইয়া এবং আস্বাদ অনুভব করিয়া খাওয়া উচিত। দাঁত এবং জিভের যথোচিত সদ্ব্যবহার না করিয়া খাইলে সে খাদ্য উত্তমরূপে হজম হইবে না। না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিলে অন্যান্য জীবদিগের চলিবে, কিন্তু আমাদের তাহা কিছুতেই চলিবে না, কারণ আমাদের হজমশক্তি উহারই উপর নির্ভর করিয়া ক্রিয়া করিতে পারে, অন্যথা তাহা পারে না। চিবানোর দ্বারাই আমাদের হজমের প্রথম ক্রিয়া শুরু হয়, .এই ক্রিয়াটি উত্তমরূপে না সাধিত হইলে, পরবর্তী ক্রিয়াগুলিও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। তাড়াতাড়ি গিলিয়া খাওয়াটাই অনেকের ডিসপেপসিয়া রোগের প্রধান কারণ।

উত্তমরূপে চিবাইলে যে খাদ্য কেবল নরম হইয়া যায়, তাহা নয়, দাঁতের ও জিভের কাজগুলি হওয়াতে প্রচুর লালা নির্গত হইয়া খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়, এবং উহার দ্বারাই খাদ্য অনেকটা হজম হইয়া যায়। এইজন্য খাইবার সময় প্রত্যেকেরই দাঁতের সদ্ব্যবহার করা উচিত। দাঁত খারাপ থাকিলে, তাহা তাড়াতাড়ি সারাইয়া লওয়া উচিত এবং দাঁত না থাকিলে বাঁধাইয়া লওয়া উচিত।

(৭) খাদ্যের সহিত বেশি পরিমাণে জল খাওয়া উচিত নয়। ঠাণ্ডা জল পেটে পড়িলে ঝিল্লি সংকুচিত হইয়া পাচক-রস উত্তমরূপে নির্গত হইতে পারে না এবং যাহা নির্গত হয়, তাহাও পাতলা হইয়া গিয়া উত্তমরূপে ক্রিয়া করিতে পারে না। খাদ্যদ্রব্য তাড়াতাড়ি গিলিয়া

ফেলিবার জন্য আমরা খাইবার সময় পুনঃপুনঃ জল খাওয়া অভ্যাস করি এবং বাল্যকাল হইতেই আমাদের এই অভ্যাস শুরু হয়। কিন্তু উত্তমরূপে চিবাইয়া ধীরে সুস্থে খাইলে পুনঃপুনঃ জল পান আবশ্যক হয় না।

(৮) খাদ্যের সহিত কতকগুলি বায়ু গলাধঃকরণ করা উচিত নয়। ইহাও আমরা প্রায়ই করিয়া থাকি। অত্যন্ত গরম পানীয় যখন আমরা শব্দ করিয়া অল্পে অল্পে চুমুক দিয়া খাই, তখন উহার সহিত অনেক বায়ু পেটের ভিতর যায়। যখন ভাতের সহিত প্রচুর ডাল মাখিয়া হাপুস-হুপুস শব্দ করিয়া খাই, তখনও উহার সহিত বায়ু পেটে যায়। অনর্থক কতকগুলি বায়ু ভক্ষণ করায় উহাতে হজমের অনিষ্ট হয়। ঐ বায়ু পেট হইতে নির্গত করিতে উদ্গার করিতে হয় এবং না নির্গত হইলে পেট ফাঁপে। ডিসপেপসিয়া রোগের ইহাও একটি অন্যতম কারণ। এইরূপ সশব্দে আহার করা সভ্যসমাজের রীতি নয়, এবং বিজ্ঞানের অনুমোদিত নয়, উহা অভ্যাস না করাই ভালো।

অবস্থাভেদে খাদ্য

শিশুখাদ্য

জন্মের পর হইতে কিছুকাল পর্যন্ত মনুষ্যশিশুকে বাহিরের কোনো খাদ্য দিবার আবশ্যক হয় না। মাতৃদুগ্ধই শিশুর পক্ষে একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। এই খাদ্যই শিশু সর্বাপেক্ষা সহজে হজম করিতে পারে এবং ইহার দ্বারা শিশু যেরূপ পুষ্টিলাভ করে অন্য কোনো খাদ্যের দ্বারা তাহা হইতে পারে না। স্তন্যপান করানোই শিশুর জীবনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ, কারণ তাহাতে বাহির হইতে খাদ্যের দ্বারা কোনো প্রকার রোগও সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু তাই বলিয়া শিশু মাতৃস্তন্য পান করিতেছে দেখিলেই যে উহার খাদ্য সম্বন্ধে আর 'ভাবিবার কিছুই নাই এরূপ ধারণা করা উচিত নয়। মাতৃদুগ্ধ সে উচিত পরিমাণে পাইতেছে কি না, উহাতে তাহার যথেষ্ট পুষ্টি হইতেছে কি না, কোন্ অবস্থায় কতটা পরিমাণ দুধ খাইতে দেওয়া উচিত, কতদিন পর্যন্ত কেবল মাতৃস্তন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা যাইতে পারে, কখন্ হইতে অন্যান্য খাদ্যও দেওয়া প্রয়োজন, ইত্যাদি অনেক কথা চিন্তা করিবার আছে।

শিশুদের পক্ষে কতটা খাদ্যের আবশ্যক? প্রথমে ইহাই বিবেচ্য। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক পরিমাপ অনুসারে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জন্মগ্রহণের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শিশুদের ২০০ ক্যালোরি মূল্যের খাদ্য দৈনিক আবশ্যক হয়। তৎপরে উহার প্রয়োজনের মাত্রা বাড়িতে থাকে এবং এক মাসের শিশুর জন্য ৫০০ ক্যালোরি মূল্যের খাদ্য দৈনিক প্রয়োজন হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া এক বৎসর বয়স্ক শিশুর প্রত্যহ ১০০০ ক্যালোরি-মূল্যের খাদ্য আবশ্যক হয়। ক্রমশ উহার মাত্রা আরও বাড়িতে বাড়িতে আট বৎসরের ছেলেমেয়েদের পক্ষে ২০০০ ক্যালোরি প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

ওজন অনুসারে বিজ্ঞানের নির্দেশ এই যে, শিশুর শারীরিক ওজন অনুপাতে প্রতি সেরে ১০০ ক্যালোরি খাদ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা যদি ধরিয়া লই যে এক মাসের শিশুর ওজন ৫ সের হইবে, তবে উহার জন্য ৫০০ ক্যালোরি খাদ্যের প্রয়োজন। এক বৎসরের শিশুর ওজন যদি হয় ১০ সের, তবে উহার জন্য ১০০০ ক্যালোরি প্রয়োজন। সুতরাং যে দিক দিয়াই ধরা যাক, মোটামুটি আমরা একই পরিমাপে আসিয়া উপস্থিত হই।

কিন্তু ক্যালোরি মূল্যের কথা বৈজ্ঞানিকেরা বুঝিলেও সাধারণে তাহা

বুঝিবে না। সাধারণকে বুঝাইতে হইলে তাহাদেরই পরিচিত ওজন অনুসারে উহা বলিতে হইবে। মানুষের দুধ এবং গোরুর দুধের খাদ্যমূল্য প্রতি আউন্সে প্রায় ২০ ক্যালোরি। অতএব এক মাসের শিশুর ৫০০ ক্যালোরির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উহাকে প্রত্যহ ২৫ আউন্স, অর্থাৎ আন্দাজ তিন পোয়া দুধ পান করিতে দেওয়া দরকার। এক বৎসরের শিশুর ১০০০ ক্যালোরির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উহাকে ৫০ আউন্স, অর্থাৎ আন্দাজ দেড় সের দুধ দেওয়া দরকার।

এখন প্রশ্ন এই, মনুষ্যমাতা আপন স্তন হইতে দৈনিক কতটা দুধ সরবরাহ করিতে পারেন। তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আমাদের দেশের জননীদের স্তনে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় গড়ে ৩২ আউন্স অর্থাৎ এক সের করিয়া দুধ জন্মায়, তাহার অধিক হয় না। অতএব আমাদের পূর্বোল্লিখিত হিসাবমতে শিশুকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত কেবল মাতৃদুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়া রাখা যাইতে পারে, তৎপরে উহা ব্যতীত আরো কিছু গোরুর দুধ দিবার আবশ্যক হয়।

সাধারণত মাতৃস্তন্য হইতেই শিশু উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পায় বটে, কিন্তু কোনো কোনো মাতার স্তনে তেমন অধিক দুধ জন্মায় না, অর্থাৎ যাহা পাওয়া যায় তাহা যথেষ্ট নয়। জন্মের পর হইতেই গোরুর দুধ দিবার প্রয়োজন হইলে এক ভাগ দুধের সহিত দুই ভাগ জল মিশাইয়া উহা পাতলা করিয়া দেওয়া উচিত। এক সপ্তাহের পর হইতে সমান সমান পরিমাণ জল ও দুধ মিশাইয়া তাহাতে কিছু চিনি দিয়া শিশুকে পান করাইতে হয়। ছয়মাস বয়স অতিক্রম করিবার পর আর জল না মিশাইয়া খাঁটি গোরুর দুধ অল্প চিনি দিয়া পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। মাতৃদুগ্ধ শিশুর যে পরিমাণে আবশ্যক গোরুর দুধ সেই পরিমাণেই দিতে হইবে।

আজকাল গোরুর দুধের পরিবর্তে অনেকে পেটেণ্ট ফুড বা গুঁড়া দুধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এক ভাগ গুঁড়ার সহিত আট ভাগ জল (ফুটানো) মিশাইয়া এইগুলি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাতে উহা অনেকটা মাতৃদুগ্ধের সমান হয়। এইগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্মূল্য তদ্ভিন্ন উহার অন্য কোনো দোষ নাই।

ছয় মাসের নিম্নবয়স্ক শিশুকে দুধের সহিত বার্লি, সাগু প্রভৃতি মিশাইয়া কখনই খাইতে দেওয়া উচিত নয়। এইগুলি স্টার্চযুক্ত খাদ্য, ছয় মাসের নিম্নবয়স্ক শিশুর উহা হজম করিবার শক্তি নাই, অতএব ঐ সকল খাদ্য খাইতে দিলেই তাহাদের পেটের দোষ জন্মায়। ছয় মাস বয়স অতিক্রম করিবার পর শিশুকে দুধের সহিত বার্লি প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

দুধ ব্যতীত শিশুদের দ্বিতীয় মাস হইতে কিছু অতিরিক্ত ভিটামিন 'সি' দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। মাতৃদুগ্ধে উহা অল্প পরিমাণে থাকে বটে, কিন্তু গোরুর দুধে যেটুকু থাকে তাহা ফুটাইলে নষ্ট হইয়া যায়। অথচ রক্তসমৃদ্ধির জন্য ইহা প্রয়োজন। সেইজন্য ভিটামিন সি-যুক্ত কিছু ফলের রস শিশুকে অতিরিক্ত খাদ্য হিসাবে দেওয়া উচিত। কমলালেবু অথবা টোমাটোর রস দুই চামচ দিলেই যথেষ্ট, তাহাতে ৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে। ঐ সকল ফলের অভাবে আমের রস অথবা পেঁপের রস নিংড়াইয়াও দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা ব্যতীত শিশুর কিছু ভিটামিন এ এবং ডি-ও প্রয়োজন। ভিটামিন এ মাতৃদুগ্ধে এবং গোরুর দুধে পাওয়া যায় বটে, তথাপি অনেকে ৫ ফোঁটা হইতে ১০ ফোঁটা করিয়া কড্‌লিভার অয়েল দিতে বলেন। ইহাতে শরীরের পুষ্টি হয়। কড্‌লিভার অয়েলে ভিটামিন ডি-ও আছে। কিন্তু আমাদের সূর্যকিরণে নিত্যস্নাত দেশে উহা শিশুকে

স্বতন্ত্রভাবে দিবার তেমন আবশ্যক হয় না। অনাবৃত দেহে রৌদ্র লাগিতে দিলেই তাহাতে গাত্রচর্মে ভিটামিন ডি জন্মায় এবং উহা রক্তের সহিত প্রবেশ করিা খাদ্যের কাজ করে।

শিশুকে মাতৃদুগ্ধ ছাড়াইবার সময় কখন্? লীগ অফ নেশনসের তরফ হইতে নিযুক্ত স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় কমিশন নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে, অন্যান্য কৃত্রিম দুধ পান করিতে দিলেও নয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে কিছু পরিমাণে মাতৃস্তন্য পান করাইতেই হইবে, দশ মাসে পড়িলে উহা বন্ধ করিয়া দিবে। একেবারে অকস্মাৎ মাতৃদুগ্ধ ছাড়ানো যায় না, এইজন্য সাত মাস হইতেই উহা ক্রমে ক্রমে আরম্ভ করা দরকার। তখন হইতেই স্তন্যপানের সংখ্যা চারবারের পরিবর্তে তিনবার করিতে হয় এবং গোরুর দুধের মাত্রা বাড়াইয়া ও অল্প অল্প কঠিন খাদ্য খাইতে দিয়া উহার অভাব পূরণ করিতে হয়। ছয় মাসের পর হইতেই শিশুর মুখে ভাত দিতে পারা যায়, কারণ তখন উহার স্টার্চ হজম করিবার ক্ষমতা হইয়াছে। দশ মাসে পড়িলে তখন ভাত, রুটি, লুচি, আলু, পটল, কাঁচকলা প্রভৃতি নরম তরকারি, মাছ, ডিমের হরিদ্রা অংশ প্রভৃতি আঙুলে টিপিয়া নরম করিয়া খাইতে দেওয়া চলে। এক বছর বয়স হইতে রীতিমতো ভাত তরকারি ফলমূল প্রভৃতি দেওয়া যায়। তখন আর মাতৃদুগ্ধ দিবার নিয়ম নাই, কিন্তু গোরুর দুধ অবশ্য অনেকদিন পর্যন্তই দিতে হইবে, উহাই তখনো প্রধান খাদ্য। যথেষ্ট পরিমাণে দুধ খাইতে না দিলেই শিশুর যথোচিত পুষ্টির বিঘ্ন ঘটিবে।

ছয় বৎসর পর্যন্ত পূর্বোক্ত নিয়মে বয়স এবং ওজন অনুসারে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইয়া যাইতে হয়। ছয় বৎসরের পর হইতে খাদ্যমাত্রা নির্ধারণ করিবার নিয়ম অন্যপ্রকার। বাল্য হইতে পূর্ণ যৌবনকাল পর্যন্ত মানুষের বাড়ের সময়। সুতরাং শরীরের ওজন অনুপাতে বয়স্ক

লোকের অপেক্ষা ঐ সকল অপরিণত বয়স্কদের খাদ্যের মাত্রা অনেক অধিক হওয়া উচিত। তখনকার জন্য নিয়ম এই যে, শরীরের ওজন অনুসারে প্রতি সেরে ৭০ ক্যালোরি মূল্যের খাদ্য দিতে হইবে। মনে করুন, দশ বৎসর বয়স্ক একটি বালকের ওজন ৩০ সের। তাহা হইলে উহার জন্য ২১০০ ক্যালোরির খাদ্য প্রয়োজন। ইহা বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে হইবে। বয়স্থ ব্যক্তিদের দৈনিক তিনবার করিয়া খাইলেই চলিতে পারে, কিন্তু অল্প-বয়স্কদের ৫।৬ বার করিয়া খাইতে দিতে হয়। একটি দশ বৎসর বয়স্ক ছেলে কিংবা মেয়ের জন্য কিরূপ খাদ্যের ব্যবস্থা করা উচিত, নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

প্রাতে—দুধ এক পোয়া এবং কিছু ফল = ২০০ ক্যালোরি।

১০টার সময়—ভাত ১ ছটাক, ডাল ½ ছটাক, তরকারি ১ ছটাক,
মাছ ২ খানা বা ডিম ১টা, দধি ½ ছটাক
= ৭০০ ক্যালোরি ;

২টার সময়—রুটি ১ ছটাক, তরকারি ১ ছটাক, গুড় ½ ছটাক
= ৩০০ ক্যালোরি ;

বৈকালে ৫টায়—মুড়ি বা চিঁড়া ½ ছটাক, ছানা ½ ছটাক
= ২০০ ক্যালোরি ;

রাত্রি ৮টায়—ভাত কিংবা রুটি কিংবা লুচি ১ ছটাক,
ডাল ½ ছটাক, তরকারি ১ ছটাক, দুধ এক পোয়া
= ৭০০ ক্যালোরি

সর্বসমেত ২১০০ ক্যালোরি

রুগ্ন অবস্থায় খাদ্য

সুস্থ শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল খাদ্যবস্তু যে পরিমাণে আবশ্যক, অসুস্থ শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার পরিবর্তন করিতেই হইবে, কারণ স্বাভাবিক দেহ হইতে বিকারগ্রস্ত দেহের চাহিদাও স্বতন্ত্র এবং খাদ্য গ্রহণ করিবার শক্তিও স্বতন্ত্র। যেখানে রোগহেতু সমস্ত শরীরযন্ত্রের বিপর্যয় ঘটিয়াছে অথবা উহার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে কিংবা যেখানে হজমযন্ত্রের ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে অথবা উহার সম্ভাবনা আছে, সেই সকল ক্ষেত্রেই খাদ্যের বিভিন্ন ব্যবস্থার আবশ্যক। বিশেষত যে সকল রোগ জর-সংযুক্ত, সেই সকল রোগে সাধারণ খাদ্য হানিকর্।

জ্বরে শরীরের ক্ষয় হইতে থাকে। যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, তবেই শরীর রোগের সহিত যুঝিতে পারিবে। জ্বরের জন্য যে দাহ হয় তদ্দ্বারা মেটাবলিজম্ সংক্রান্ত শারীরিক পরিবর্তন কী কী ঘটে ইহা পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, উহাতে শরীরস্থ প্রোটিন উপাদানগুলি অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নাইট্রোজেন-রূপে মূত্রের সহিত নির্গত হইতে থাকে। জ্বর যতই অধিক হয়, মূত্রে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ততই বাড়িতে থাকে। শরীরের নিজস্ব প্রোটিন এইরূপে দ্রুত নষ্ট হইয়া যাওয়াতেই জ্বরে রোগীর শরীর এত শীঘ্র শুকাইয়া যায়। তদ্ভিন্ন জ্বরে শরীরের উত্তাপ অনেক বৃদ্ধি পায়, সুতরাং ক্যালোরির খরচও বেশি হয়। দুই চারি দিনের জ্বরে ইহা কিছু মারাত্মক নয়, কিন্তু অধিক দিন জ্বর ভোগ হইলে নিশ্চয়ই তখন উহার ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত, নতুবা রোগে না হউক, খাদ্যের অভাবেই রোগীর শরীর অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়।

যেহেতু শরীরের প্রোটিনই ক্ষয় হইতেছে, অতএব জ্বর-রোগীকে প্রোটিন খাদ্য দেওয়াই যুক্তি অনুসারে কর্তব্য। কিন্তু যুক্তিতে যাহা

সংগত বলিয়া মনে হয়, বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা চলে না। প্রবল জ্বরে মাংসাদি সম্পূর্ণ প্রকারের প্রোটিন কিছুতেই দেওয়া যায় না। রোগের বিষে শরীরস্থ কোষগুলি তখন ঐ প্রকারের প্রোটিন গ্রহণ করিতেই অক্ষম, সুতরাং তখন ঐ সকল প্রোটিন দিলে বিপরীত ফল হয়, উহা রক্তের মধ্যে জমিয়া থাকিয়া লিভার ও কিডনীকে আরো জখম করে।

তবে ক্ষয় নিবারণের উপায় কী? উপায় দুধ খাইতে দেওয়া। দুধের প্রোটিন ঐরূপ অনিষ্টকারী নয়। জ্বরের রোগীকে যদি অন্তত দেড় সের কিংবা দুই সের করিয়া দুধ প্রত্যহ দেওয়া যায় তবে উহার ক্ষয় অনেকটা নিবারণ হইতে পারে। যাহারা এতটা দুধ খাইতে নারাজ, তাহাদের দুধের সহিত প্লাজ্‌মন মিশাইয়া দিলেই উহার প্রোটিনের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, ও তখন অপেক্ষাকৃত অল্প দুধেই কাজ হইবে। কঠিন জ্বরেও দুধ দিতে কোনোই অনিষ্ট নাই, যদি রোগীর উহা হজম করিবার ক্ষমতা থাকে।

দুধ ছাড়া আরো উপায় আছে—কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেটকে জ্বরের অবস্থার প্রোটিনরক্ষাকারী বলা হয়। কার্বোহাইড্রেটের গুণই এই, উহা ইন্ধনের কাজ করিতে বিশেষ পটু। অতএব জ্বরের তাপে দগ্ধ হইবার জন্য যতটা অধিক ইন্ধনের প্রয়োজন, তাহা যদি বাহির হইতে কার্বোহাইড্রেটের দ্বারা নিত্য সরবরাহ করা হয়, তবে আর শরীরের প্রোটিন সঞ্চয়ের উপর বিশেষ টান পড়ে না। এইরূপে কার্বোহাইড্রেট ইন্ধন যোগাইয়া বহুদিন পর্যন্ত জ্বরের রোগীকে সবল রাখিতে পারা যায়। তবে এমন কার্বোহাইড্রেট দিতে হইবে যাহা রোগীর দ্বারা সহজে হজম হয়। ভাত রুটিও উত্তম কার্বোহাইড্রেট, কিন্তু তাহা রোগীকে দিতে পারা যায় না। সেইজন্যই চিকিৎসকেরা রোগীর জন্য বালি, সাগু, শটি, এরারুট, ওটমিল প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সকল প্রকার

কার্বোহাইড্রেটই গ্লুকোজে পরিণত হইয়া তৎপরে হজম হয়। যদি ঐটুকুর জন্যও অবসর না দিয়া একেবারেই গ্লুকোজ ব্যবহার করা হয় তবে রোগীর হজমযন্ত্রের অনেক শ্রমলাঘব হইয়া যায়। এমন অবস্থাও হইতে দেখা যায় যখন হজম করিবার শক্তি আদৌ নাই, তখনকার পক্ষে গ্লুকোজই সর্বোৎকৃষ্ট।

কেবল কার্বোহাইড্রেট দেওয়া অপেক্ষা উহার সহিত দুধ মিশাইয়া দেওয়া আরো উত্তম। ইহাতে দুধ হজম করিবার আরো কিছু সুবিধা হয় এবং একই পথ্যের মধ্যে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট এক সঙ্গে দেওয়া হইয়া যায়। এইজন্য প্রচলিত দুধবার্লি জ্বরের পক্ষে আদর্শ খাদ্য। উহাতে চিনি, মিছরি কিংবা গ্লুকোজ মিশাইয়া দিলে আরো উত্তম, খাইতে সুস্বাদু হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার ইন্ধনশক্তিও বাড়িয়া যায়।

রোগীর দুধ হজম না হইলে তাহা হজম করাইবার নানারূপ ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। সোডা সাইট্রেট অল্প পরিমাণে দুধের সহিত মিশাইয়া দিলে তাহা ঈষৎ ছিঁড়িয়া যায়, উহা সহজে হজম হয়। লেবুর রস প্রভৃতি দিয়া ছানা কাটিয়া দুধ খাইলেও উহা সহজে হজম হয়। যাহার নিতান্তই হজম হইতেছে না, তাহাকেও দুধের সহিত বেঞ্জার্স ফুড মিশাইয়া উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলে উহা হজম হইবে। দুধ অতি আবশ্যকীয় পথ্য বলিয়াই উহা হজম করাইবার জন্য এত প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কয়েক প্রকার ফল এবং ফলের রস রোগীর পক্ষে উপকারী পথ্য। কিন্তু এ বিষয়ে একটি কথা আছে, তাহাও এস্থলে বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে অনেকের ধারণা আছে যে, রোগ হইলে যেমন করিয়াই হউক কয়েক প্রকার ফল খাইতে দিতে হইবে, নতুবা রোগীর যত্ন সম্বন্ধে ত্রুটি হইবে এবং উহার অনিষ্ট ঘটিবে। বেদানা যখন দুর্মূল্য এবং

কমলালেবু যখন দুষ্প্রাপ্য তখনও উহা নানা উপায়ে আহরণ করিয়া রোগীকে খাওয়াইতে হইবে। প্রায়ই দেখা যায় যে, রোগের চিকিৎসায় গৃহস্থের যত ব্যয় হয়, তাহার অর্ধেক লাগিয়া যায় কেবল ফল কিনিতে। আমাদের বক্তব্য এই যে, রোগের পথ্য হিসাবে ঐ সকল ফলকে যত উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে, উহার স্থান বাস্তবিক তত উচ্চে নয়। যাহার দুধটুকু পর্যন্ত কিনিবার শক্তি নাই, তাহাকেও যে ঋণ করিয়া দুর্মূল্য ফল কিনিয়া রোগীকে খাওয়াইতে হইবে এতটা প্রয়োজনীয়তা ঐ সকল ফলের নাই। দুধ, বার্লি এবং গ্লুকোজ বা মিছরির যে প্রকারের বলকারী এবং শরীররক্ষাকারী খাদ্যগুণ আছে, ফলের রসে সে প্রকারের শক্তি থাকিতে পারে না। বেদানা খাওয়াইলেই শরীরে রক্ত সঞ্চয় হইবে এ ধারণা অতিরঞ্জিত। কিছু ফল দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন, কারণ উহা ব্যতীত অন্য কোনো পথ্যে রোগী ভিটামিন পাইবে না এবং ভিটামিনের অভাবে হানি হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যে কোনো সুলভ মূল্যের ফলের দ্বারাই সে অভাব দূর হইতে পারে। একটি বস্তুর কথা এস্থলে উল্লেখ করা যায় যাহা অত্যন্ত সহজলভ্য এবং টাটকা ভিটামিনযুক্ত। উহা ইক্ষু। আখের রস খাদ্যগুণে গ্লুকোজ অপেক্ষাও উত্তম। ইহাতে কখনই কোনো অপকার করে না, প্রবল জ্বরেও অনায়াসে দিতে পারা যায়। চিবাইয়া খাইতে পারিলে ইহাতে আপনা হইতে দাঁত পরিষ্কার হইয়া যায় এবং মুখের জড়তা নষ্ট করে। এ-ছাড়া শাঁকআলুর এবং কেশুরের রস ছাঁকিয়া খাইতে দিলে রোগীর অনিষ্ট হয় না, উহা খাইতেও সুস্বাদু। জামরুল হইতে এবং কালোজাম হইতেও রস বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। পাকা আনারসের রসও অতি উত্তম, জ্বরে অনায়াসে দেওয়া যায়।

সাধারণ জ্বরের বিজ্বর অবস্থায় খই অতি উত্তম পথ্য। খইয়ের

খাদ্যগুণ ভাতের অপেক্ষাও বেশি, অথচ ইহা ভাতের অপেক্ষা সহজপাচ্য। শুষ্ক উত্তাপে খই ফুটিয়া সেলুলোজের আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়, সুতরাং উহার শ্বেতসার বস্তু বাহির হইয়াই থাকে এবং খাইবামাত্র তাহা হজম হয়। সদ্য ভাজা খই অতি উত্তম খাদ্য, উহাতে কোনো রোগবীজাণু থাকিতে পারে না। বিস্কুট অপেক্ষা খই অনেক ভালো। হিক্কা এবং বমন নিবারণ করিতে খই বিশেষ উপকারী। খইয়ের মণ্ড করিয়া খাওয়া উত্তম। দুধে খই ফেলিলে উহা ভিতরে ভিতরে দুধ শুষিয়া লয়, তখন দুধ এবং খই উভয়ই শীঘ্র হজম হয়।

জ্বরের রোগীকে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিতে দিতে হয়। জ্বর হইলেই শরীরে যে দাহ হয়, তাহাতে স্বাভাবিক অপেক্ষা অতিরিক্ত আবর্জনা উৎপন্ন হয় এবং উহা রক্তের মধ্যে আসিয়া জমা হয়। ঐ আবর্জনা নিকাশের একমাত্র উপায় মূত্র এবং ঘর্মাদির দ্বারা। মূত্র বৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় জল পান করা। অতএব রোগীকে জল পান করানো সম্বন্ধেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, দেখিতে হইবে যেন সে সমস্ত দিনে অন্তত দুই সের জল পান করে। জলের সহিত গ্লুকোজ বা ল্যাকটোজ মিশাইয়াও পান করিতে দেওয়া যায়। তাহাতে পানীয় এবং পথ্য একসঙ্গেই প্রয়োগ করা হয়।

গর্ভাবস্থায় খাদ্য

গর্ভাবস্থাকে শরীরের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা বলা যাইতে পারে না। স্বাভাবিক নিয়মের বশেই স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তানের জন্ম হয়, সেই সময় শারীরিক অবস্থা সাধারণ শরীর হইতে স্বতন্ত্র হইলেও উহা অস্বাভাবিক নয়। অতএব সাধারণ অভ্যস্ত খাদ্যের দ্বারাই স্ত্রীলোকের সন্তানধারণের কাল নির্বিঘ্নে কাটিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থা না

হইলেও শরীরের মধ্যে তখন যে সকল অতিরিক্ত ক্রিয়া চলিতে থাকে তদনুসারে খাদ্যেরও কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাহা না করিলেই গর্ভিণীর শরীরে প্রায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। কেবল মাতার নয়, গর্ভস্থ সন্তানের স্বাভাবিক পুষ্টিও একান্তরূপে নির্ভর করে মাতার খাদ্যের উপর; সুতরাং ঐ অবস্থায় খাদ্য সম্বন্ধে অবহেলা ঘটিলে উভয় পক্ষেরই অমঙ্গল হয়। কিন্তু গর্ভাবস্থায় দুইটি প্রাণীর উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন বলিয়া মাতাকে অভ্যস্ত খাদ্যের দ্বিগুণ পরিমাণ খাইতে হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াই তাহার পক্ষে প্রয়োজন।

অন্যান্য নানাপ্রকার উপাদানের মধ্যে সন্তানের শরীর গঠনের পক্ষে বিশেষ করিয়া আবশ্যক ক্যালসিয়ম, ফসফরাস, লৌহ, আইওডিন, আর ভিটামিন এ এবং ডি। অতএব এই সকল দ্রব্য যে খাদ্যগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে তাহাই বাছিয়া বাছিয়া গর্ভাবস্থায় খাওয়ানো উচিত। ক্যালসিয়ম যথেষ্ট পরিমাণে আছে দুধে এবং দুধ হইতে প্রস্তুত চীজ বা পনীরে; তদ্ভিন্ন ইহা আরো কয়েকটি খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, যথা—ডিমের হরিদ্রা অংশে, বরবটি, ফুলকপি, ডুমুর প্রভৃতি তরকারিতে, জাঁতা-ভাঙা লাল আটায় এবং গুড়ে। ফসফরাস যথেষ্ট পরিমাণে আছে পনীরে, মাছ মাংসাদিতে ও ডিমের হরিদ্রা অংশে, বরবটি কলাইশুঁটি প্রভৃতিতে, আটা ময়দায়, বাদামে এবং কোকোতে। এই সকল খাদ্য খাইলেই গর্ভস্থ সন্তান ক্যালসিয়ম ও ফসফরাস প্রচুর পরিমাণে পাইতে পারে। কিন্তু কেবল এই সকল খাদ্য খাইলেই কার্যসিদ্ধ হইবে না, যদি উহার সহিত ক্যালসিয়ম ও ফসফরাস ধারণ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত বস্তুও গ্রহণ করা না হয়। এই ধারক বস্তু ভিটামিন ডি। ভিটামিন ডি যদি খাদ্যের মধ্যে থাকে তবেই ক্যালসিয়ম

ও ফসফরাস যথারীতি হজম হইয়া রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং তখন উহা কাজে লাগিবে। দুধের দ্বারা এই কার্য উত্তমরূপে সাধিত হয়। দুধে ভিটামিন ডি-ও আছে এবং ক্যালসিয়ম আর ফসফরাসও কিছু মাত্রায় আছে। তদ্‌ব্যতীত দুধে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন বি-ও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। অতএব কেবলমাত্র উপযুক্ত মাত্রায় দুধ খাইলেই অনেকগুলি প্রয়োজন একসঙ্গে মিটিয়া যায়। গর্ভাবস্থার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত এবং তৎপরে যতদিন পর্যন্ত সন্তানকে স্তন্য দান করা হয় ততদিন মাতাকে প্রত্যহ অন্তত এক সের করিয়া দুধ নিশ্চয়ই খাইতে দেওয়া উচিত।

দুধ ব্যতীত আরো একটি দ্রব্যে প্রচুর ভিটামিন এ এবং ডি আছে, উহা কড্‌লিভার অয়েল। ইহাও ক্যালসিয়ম এবং ফসফরাস ধারণ করিয়া রাখিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। এইজন্য চিকিৎসকেরা গর্ভিণীদের কিছু পরিমাণে কড্‌লিভার অয়েল খাইতে উপদেশ দেন। আজকাল বাজারে ভিটামিন এ এবং ডি প্রযুক্ত অনেক পেটেণ্ট ঔষধ পাওয়া যায়, তাহাও চিকিৎসকেরা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ভিটামিন এ-র অপর একটি বিশিষ্ট গুণ এই যে উহা গর্ভকালীন রোগপ্রবণতা কমাইয়া দেয়।

লৌহের কথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। উহাও গর্ভিণীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। মাতার শরীরে যে লৌহ সঞ্চিত থাকে তাহার অধিকাংশই গর্ভস্থ সন্তান টানিয়া লয় এবং আপন যকৃতের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। ইহার কিছু উদ্দেশ্য আছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রায় বৎসরাবধি কাল তাহাকে কেবল দুধ খাইয়াই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। দুধে অন্যান্য উপাদান যথেষ্ট থাকিলেও লৌহের মাত্রা অত্যন্ত কম। অতএব ঐ একবৎসর কাল লৌহের অভাব মিটাইবার

জন্য প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাকে পূর্ব হইতেই মাতার শরীরের লৌহ লইয়া আপন যকৃতে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। এইজন্যই দেখা যায় যে গর্ভকালে স্ত্রীলোকেরা সাধারণত রক্তহীন হইয়া পড়ে। যাহাতে প্রচুর লৌহ আছে, গর্ভাবস্থায় সেই সকল খাদ্য বিশেষ করিয়া দেওয়া উচিত, যথা—মাংসাদি, জান্তব যকৃত বা মেটে, ডিম, জাঁতার আটা, বরবটি, কলাইশুঁটি, বীট শাক, পালং শাক, কলা, কালোজাম, ডুমুর, খেজুর, বাদাম, পেস্তা এবং গুড়।

আইওডিনের প্রয়োজন মাতা ও সন্তান উভয়েরই জন্য। ইহার অভাবে সন্তানের নানারূপ অঙ্গবিকৃতি ঘটে এবং বহুসন্তানবতী জননীদের গয়টার নামক রোগ উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত খাদ্যগুলিতে আইওডিন আছে,— সমুদ্রের মাছ, সাধারণ মাছ ও চিংড়ি মাছ, মাখন, ওটমিল ও বার্লি, বরবটি ও শুঁটি, গাজর, পালং শাক, টেঁপারি ও কুল।

প্রধানত কী কী দ্রব্য গর্ভাবস্থার পক্ষে আবশ্যক তাহা জানা থাকিলে গর্ভিণীর ব্যক্তিগত রুচি ও অভ্যাস অনুসারে দৈনন্দিন খাদ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়। ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ জনৈক খ্যাতনামা চিকিৎসকের প্রস্তাবিত একটি তালিকা আমরা এইখানে সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। এই তালিকা অনুসারে গর্ভবতীদের খাদ্যের ব্যবস্থা করিলে কোনো প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ঘটিবে না।

শস্যাদির মধ্যে—ঢেঁকিছাঁটা চাল, জাঁতাভাঙা লাল আটা ও সুজি।

তরকারি—পালং শাক ও অন্যান্য প্রকার শাকসবজি এবং ডাঁটা (কিন্তু কোনোটিই ভাজিয়া নহে, ডালনা শুকতুনি বা ঝোল করিয়া), বরবটি ও কলাইশুঁটি, লাউ, শসা, বেগুন, পটোল, আলু (অধিক নয়), বাঁধাকপি, ফুলকপি, টোমাটো।

ফল—সকল প্রকার টাটকা এবং মেওয়া ফল দেওয়া যাইতে পারে।

ডিম—মুরগির কিংবা হাঁসের, কিন্তু ভাজিয়া নয়।

মাছ—কই, মাগুর, শিঙ্গি অথবা অন্যান্য ছোটো মাছ।

মাংস—মুরগির, পাঁঠার বা ভেড়ার এবং বিশেষত পাঁঠার মেটুলি। রক্তহীনতায় মেটুলি বিশেষ উপকারী।

ঘি ও তেল—অত্যন্ত কম পরিমাণেই খাওয়া উচিত। এইগুলি অধিক মাত্রায় খাওয়াই গর্ভাবস্থার বমনপীড়ার একটি প্রধান কারণ।

দুধ—প্রত্যহ এক সের করিয়া দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। গোরুর দুধ অথবা ছাগলের দুধও দেওয়া যাইতে পারে। দুধ সহ্য না হইলে দধি বা ঘোল দেওয়া যায়।

মিষ্টদ্রব্য—রিফাইন করা চিনি অপেক্ষা অন্যান্য মিষ্টিই ভালো। চিনি হইতে প্রস্তুত বাজারের মিষ্টান্নাদি এবং কেক প্রভৃতি খাওয়া উচিত নয়। তৎপরিবর্তে গুড়, মধু, জাম, জেলি, গ্লুকোজ প্রভৃতি খাওয়া উত্তম।

লবণ—অধিক খাওয়া উচিত নয়। শোথের সম্ভাবনা দেখিলে ইহার মাত্রা অত্যন্ত কমাইয়া দেওয়া উচিত, অথবা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ারও প্রয়োজন হইতে পারে।

পানীয়—জল যত ইচ্ছা পান করা যাইতে পারে, ইহাতে কোনো বাধা নাই। ডাবের জল গর্ভিণীদের পক্ষে অতি উত্তম পানীয়। চা কিংবা কফি পাতলা করিয়া প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়। কোকো গর্ভাবস্থার পক্ষে অতি উত্তম পানীয়। লেবুর রস দিয়া সরবৎ দেওয়া যাইতে পারে। সোডা ওয়াটার বা লিমনেড প্রভৃতিও পান করিতে দেওয়া যায়।

প্রসবের পরে যতদিন পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যপান করিতে দেওয়া হয়

ততদিন পর্যন্ত মাতার খাদ্যাদি সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রকার ব্যবস্থাই রাখা উচিত। কারণ দুগ্ধ দান করিবার কালেও মাতাকে শরীর হইতে যথেষ্টই ব্যয় করিতে হয়, সুতরাং উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। তদ্ভিন্ন তখন সন্তানের পুষ্টি মাতার দুগ্ধের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, উহা ব্যতীত তাহার দ্বিতীয় খাদ্য নাই। অতএব মাতার দুগ্ধ যাহাতে কোনো অংশে অপ্রতুল না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় মাতাকে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ খাইতে দেওয়া। আমাদের দেশে দুধ সাবু খাইতে দেওয়ার রীতি আছে, ইহাও অতি উত্তম ব্যবস্থা। অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজন করাইলে স্তনদুগ্ধ কখনই বাড়ে না, প্রয়োজনীয় খাদ্যগুলি উচিত মাত্রায় খাইতে দিলেই তাহা বাড়ে। এ-সময় অতিরিক্ত চা পান করা কমাইয়া দেওয়া উচিত। অতিরিক্ত ঝাল বা সরিষা প্রভৃতি প্রচুর মশলাযুক্ত তরকারি কিংবা প্রচুর টক দ্রব্য মাতাকে খাইতে দেওয়া উচিত নয়।

অনুক্রমণিকা

বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যা

অগ্নাশয় (Pancreas)—পাকস্থলীর পশ্চাতে অবস্থিত একপ্রকার গণ্ড, ইহার রসের দ্বারা নানাপ্রকার খাদ্যবস্তু পরিপাক হয়।

অম্ল, ক্ষার (Acid, alkali)— অধিকাংশ রাসায়নিক যৌগিক পদার্থমাত্রই অম্লধর্মী অথবা ক্ষারধর্মী। এই দুই রাসায়নিক গুণ পরস্পর বিরোধী।

অসমোসিস্ (Osmosis)— বিভিন্ন গুরুত্বসম্পন্ন দুটি তরল পদার্থ পাতলা ঝিল্লিগাত্রের দুই পার্শ্বে অবস্থিত থাকিলে বেশি গুরুত্বসম্পন্নটি ঝিল্লিগাত্র চুঁইয়া কম গুরুত্বসম্পন্নটির সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং সমগুরুত্ব সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াকে অস্মোসিস্ বলে।

আহার্যের রাসায়নিক উপাদান (Chemical-components of food)—প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট।

অ্যামিনো-অ্যাসিড (Amino-Acid)—প্রোটিন খাদ্যমাত্রই হজম হইয়া প্রথমে অ্যামিনো-অ্যাসিডে পরিণত হয়, তৎপরে উহা শরীর-কোষের গ্রাহ্য হয়। অ্যামিনো-অ্যাসিড প্রায় ১৯ প্রকারের আছে, বিভিন্নরূপ প্রোটিন খাদ্য হইতে তাহার উৎপত্তি।

অ্যালব্যুমেন (Albumen)— জৈব-প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হইয়া অ্যালব্যুমেন নামক একরূপ পদার্থ জন্মায়। উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাখির ডিমের সাদা অংশটি।

ইনজেকসান (Injection)—সূচীবিদ্ধ করিয়া শরীরে ঔষধ প্রয়োগ করাইবার প্রক্রিয়া।

ইন্সুলিন (Insulin)— প্যাংক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয়ের একপ্রকার আভ্যন্তরিক রস। ইহার অভাবে ডায়েবিটিস নামক রোগ জন্মায়।

ইউরিয়া (Urea)— প্রোটিন খাদ্যের উদ্‌বৃত্ত অ্যামিনো-অ্যাসিড যকৃতের ক্রিয়াতে ইউরিয়া নামক জটিল রাসায়নিক দ্রব্যে পরিণত হয় এবং উহা মূত্রের সহিত নির্গত হয়।

ওলীন (Olein)— মাখন ও চর্বিজাতীয় খাদ্যের একপ্রকার উপাদান।

কাইল (Chyle)— চর্বি ও তৈলজাতীয় খাদ্যগুলি হজম হইয়া একপ্রকার ঘন দুধের ন্যায় অবস্থায় পরিণত হয়, তাহার নাম কাইল।

কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon Dioxide)— বায়ুমধ্যস্থ বাষ্প। ইহা আমরা নিঃশ্বাসের সহিত অনেক পরিমাণে ত্যাগ করি।

কিডনি (Kidney)— মূত্র প্রস্তুতকারক ছাঁকুনি যন্ত্র। কিডনি-যন্ত্র পেটের ভিতর দুইদিকে দুইটি আছে, বাংলাভাষায় উহাকে বৃক্ক বলে।

কেসিন (Casien)— দুধের ছানার ভিতরকার প্রোটিন অংশ।

কেফিন (Caffeine)—কেফিন চা ও কফির অভ্যন্তরস্থ একপ্রকার উপক্ষার।

কোষ (Cell)— প্রোটোপ্লাজম্ ও নিউক্লিয়াস্ দ্বারা গঠিত জীব-শরীর গঠনের অতি সূক্ষ্ম মূল জীবন্ত উপাদান।

ক্যালোরি, ক্যালোরিমিটার (Calorie, Calorimeter)— উত্তাপের পরিমাণ নির্দেশ করিবার জন্য ক্যালোরি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। উহা মাপিবার যন্ত্রের নাম ক্যালোরিমিটার। যেহেতু খাদ্যের দ্বারাই শরীরে তাপ উৎপন্ন হয়, সেই হেতু ক্যালোরি অনুসারেই খাদ্যের পরিমাপ করা হইয়া থাকে।

ক্লোরোফর্ম (Chloroform)— ইহা একপ্রকার ঔষধ যাহার আঘ্রাণ লইলে জীবমাত্রেই অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

গণ্ড (Gland)— জৈবকোষ দ্বারা গঠিত গ্রন্থি বিশেষ। আমাদের শরীরের নানাস্থানে এই সব গ্রন্থি অবস্থিত আছে। ইহাদের কাজ নানারূপ রস নিঃসরণ করা।

গ্লাইকোজেন (Glycogen)— কার্বোহাইড্রেট খাদ্যমাত্রেই হজম হইয়া যকৃতে গিয়া গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়।

গ্যাস (Gas)— পদার্থমাত্র তিন অবস্থায় থাকিতে পারে— কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়। শেষোক্ত অবস্থাকে ইংরেজিতে 'গ্যাস' বলে। উদাহরণ— হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি।

চিনি— লেভুলোজ, মলটোজ, ইনভার্টোজ, লাক্টোজ, ডেকেট্রাজ, সুক্রোজ, গ্লুকোজ— চিনি বা শর্করার নানান রূপান্তর।

জারকরস—অ্যাসাইলেজ, লাইপেজ, ট্রিপসিন, ট্রিয়াপসিন, ইরেপসিন, পেপসিন।

ট্যানিক অ্যাসিড (Tannic Acid)— উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন অম্লধর্মী পদার্থ বিশেষ। ইহার ক্রিয়া ধারক এবং অতি মাত্রায় শরীরের পক্ষে হানিকারক।

ডুয়োডিনাম (Duodenum)— পাকস্থলীর পরেই ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথম অংশের নাম।

ডিগ্রী (Degree)— উত্তাপের মাপ। থার্মোমিটার যন্ত্রের দ্বারা ইহা নিরূপণ করিতে হয়।

থাইরয়েড (Thyroid)— গলদেশে অবস্থিত একপ্রকার গণ্ড। ইহার ক্রিয়াতে শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়াসমূহ দ্রুতবেগে অথবা মন্থর-গতিতে চালিত হয়।

থিওব্রমিন (Thiobromine)— কেফিনের ন্যায় একপ্রকার উত্তেজক বস্তু, কোকোর মধ্যে পাওয়া যায়।

দ্রাবক (Solvent)— যাহার দ্বারা অধিকাংশ কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত হয়।

পিত্ত, পিত্তনালী (Bile)— যকৃতের রসের নাম পিত্ত। পিত্তনালীর দ্বারা উহা বাহিত হইয়া অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে।

পেপটোন, পেপটোনাইজ (Peptone, Peptonise)— প্রোটিন খাদ্যগুলিকে পাচকরস প্রথমে পেপটোনে পরিণত করে, তৎপরে উহা অ্যামিনো-অ্যাসিড হইয়া যায়। অতএব পেপটোনাইজ করার অর্থ দুধ প্রভৃতি খাদ্যকে কতকটা হজম করাইয়া দেওয়া। কৃত্রিম উপায়েও ইহা হইতে পারে।

পেপসিন (Pepsin)— পাকস্থলীর পাচকরসের একপ্রকার প্রোটিন জারক।

পোর্টাল শিরা (Portal vein)— যে শিরার দ্বারা হজমীকৃত খাদ্যের তরলসার রক্তের সহিত যকৃতে নীত হয়।

পেলাগ্রা (Pellagra)— একপ্রকার চর্মরোগ, ভিটামিন বি-এর অভাবে হয়।

প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm)— জৈবকোষের মূল উপাদান, দেখিতে জেলিবৎ।

পৌষ্টিকনালী (Digestive Canal)— ইহার অপর নাম মহাস্রোত। জন্তুদের শরীরে যে সমগ্র নলটির মধ্যে খাদ্যগুলি প্রবেশ করে ও হজম হয়। ধারাবাহিকভাবে ইহার বিভিন্ন অংশের নাম :— গলনালী, অন্ননালী, পাকস্থলী, অন্ত্রনালী, মলনালী। একই অবিচ্ছিন্ন নলের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন রূপান্তর।

ফুট-পাউণ্ড (Foot-Pound)— কোনো এক পাউণ্ড (অর্থাৎ আধ সের) ওজনের জিনিস এক ফুট পরিমাণ তুলিতে যে শক্তি লাগে তাহার পরিমাপের সংজ্ঞা।

বীজাণু (Bacteria)—অতি সূক্ষ্ম জীব।

ব্যসিলাই (Bacilli)— দণ্ডাকৃতি বীজাণুর নাম।

ভিটামিন— (Vitamin)— কয়েকপ্রকার খাদ্যমধ্যস্থ জটিল রাসায়নিক বস্তু, যাহার অভাবে কতকগুলি রোগ জন্মিতে পারে।

ভিলাই (Villi)— অন্ত্রমধ্যস্থ একপ্রকার শুঁয়া, যাহার দ্বারা খাদ্যের তরলসারগুলি শোষিত হয়।

মাংসপেশি (Muscle)—যাহাকে ইংরেজিতে মাস্‌ল্‌ বলি, এবং যাহার সাহায্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির চালনা করি।

মিলিগ্র্যাম (Milligram)— সূক্ষ্ম ওজন, ১ গ্র্যামের হাজার ভাগের এক ভাগ। ১ গ্রাম অর্থে ইংরেজি ওজনের ১৫ গ্রেণ।

মেটাবলিজ্‌ম্‌ (Metabolism)— জীবদেহ শ্রমের দ্বারা নিয়ত যেমন একদিকে ক্ষয় হইতেছে, অপর দিকে খাদ্য এবং বাতাস হইতে নিয়ত সেই ক্ষতিপূরণ হইতেছে। এই ভাঙা গড়া প্রক্রিয়াকে সমগ্রভাবে মেটাবলিজ্‌ম্‌ বলে।

মৌলিক উপাদান, শরীরের (Chemical constituents of the Body)— প্রাণীমাত্রের দেহবস্তু যেসব মৌলিকপদার্থ সংযোগে প্রস্তুত তাহার মধ্যে প্রধানত— হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন; অল্প পরিমাণে সালফার, ফসফরাস, ক্লোরিন, আইওডিন, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনিসিয়াম ইত্যাদি ধাতব বস্তু।

যকৃত (Liver)— উদরগহ্বরের উপরদেশে ডানদিকে অবস্থিত সুবৃহৎ গণ্ড, যাহাকে চলিত কথায় মেটুলি বলে।

রক্তশিরা (Vein)— যাহার মধ্য দিয়া রক্তস্রোত হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে ফিরিয়া যায়।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ (Chemical combination)— দুই কিংবা

ততোধিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ। উদাহরণ— হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে জলের উৎপত্তি।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Chemical analysis)— যৌগিক জটিল পদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সন্ধিবিচ্ছেদের দ্বারা অপেক্ষাকৃত মৌলিক অবস্থায় পরিণত করা।

লিম্ফ (Lymph)— লসিকা। রক্তের যে কণিকাবিহীন তরল অংশ ধমনীগাত্র হইতে চুঁইয়া নির্গত হয় এবং জৈবকোষগুলির সহিত খাদ্যের আদানপ্রদান করে।

লেগুমেন (Legumen)—মটর এবং ডাল জাতীয় খাদ্যের প্রোটিন।

লেসিথিন (Lecithin)— মস্তিষ্ক পুষ্টিকারক খাদ্য, ইহা দুধের ননিতে থাকে।

লেন্স (Lens)— পরকলা। ইহার সাহায্যে সূক্ষ্ম বস্তুকে বৃহৎ দেখায়।

ল্যাকটিক অ্যাসিড (Lactic Acid)— একপ্রকার অম্লগুণাত্মক রাসায়নিক দ্রব্য।

সিক্রিটিন (Secretin)— ডুয়োডিনমের গাত্র হইতে নির্গত বার্তাবহ রস।

স্টার্চ (Starch)— কার্বোহাইড্রেট মাত্রকেই স্টার্চ বলা যায়। সাধারণভাবে এরারুটকে স্টার্চ বলা হয়।

সেলুলোজ (Cellulose)— তরকারির খোসা, শস্যের ভুষি প্রভৃতি অপাচ্য অথচ সারক পদার্থ।

স্কার্ভি (Scurvy)— একপ্রকার রক্তপাতকারী রোগ, যাহা ভিটামিন সি-এর অভাবে হয়।

শ্বেতসার খাদ্য—কার্বোহাইড্রেট।

রবীন্দ্রনাথের অভিমত

কল্যাণীয়েষু,

পশুপতি, পরিভাষাবর্জিত সরল প্রণালীতে রচিত পথ্যবিচার সম্বন্ধে তোমার লেখাটি আমার ভালো লেগেছে ব'লে আমাদের লোকশিক্ষা গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাকে গ্রহণ করবার জন্যে আমি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়েছি। আমাদের দেশে কুপথ্যজীর্ণ পাকস্থলীর পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। আশা করি, তোমার এই লেখা দেশের লোকে আহার সম্বন্ধে আপন অভ্যস্ত রুচির সংস্কার সাধনে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করবে। তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ৬।১।৪১

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা